২০০০

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ১৫ তম সংখ্যা

১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ

৭৬তম সালানা জলসা

উপরে ঃ
বক্তব্য রাখছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আই)-এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসের আহমদ, নায়ের ইসলাহ্-ও-ইরশাদ

মাঝে ঃ
বক্তব্য রাখছেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী। উল্লেখ্য ৮ই অক্টোবর ১৯৯৯ ইং খুলনা মসজিদে খুতবা প্রদানকালে ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় তিনি তাঁর ডান পা হারান।

নীচে ঃ
ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের হামলায় আহতদের অনেকের মধ্যে নাসেরাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী, মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, সুন্দরবন জামাতের সদস্য স্নেহের চঞ্চল এবং বরিশাল জামাতের বিশিষ্ট সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব।

মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন করুন

জাতীয় জীবনে কতকগুলো দিন আসে যা কল্যাণ ও মহিমায় অতীব গুরুত্ববহ। মুসলেহ মাওউদ দিবস এর অন্যতম। ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ইসলামের সাহায্যার্থে আকুতিভরে মহান আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন। দোয়ার ফলস্বরূপ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী হুশিয়ারপুরে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে তিনি অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন এক মহান পুত্রের 'শুভসংবাদ' লাভ করেন এবং তা' তিনি 'সবুজ ইশতেহার' নামে দুনিয়ার সামনে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে প্রকাশ করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার উজ্জ্বল এক নিদর্শন।

আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী প্রতিশ্রুত সেই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ঐশী আকাঙ্ক্ষানুযায়ী এ পুত্রের নাম রাখা হয় বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ। এ সুযোগ্য সন্তানই আহমদীয়তের ইতিহাসে মুসলেহ মাওউদ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত সংস্কারক হিসাবে খ্যাত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং তাঁর এ পুত্রকে 'মুসলেহ মাওউদ' হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং প্রতিশ্রুত সেই পুত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে স্বয়ং ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে 'মুসলেহ মাওউদ' হওয়ার ঘোষণা দান করেন।

এ মহাপুরুষের দীর্ঘ জীবনে বিশেষ করে ৫২ বছরের খেলাফতকালে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভের নিরলস চেষ্টা করে গেছেন। দিন যতই যাবে ততই একথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত শুভসংবাদ এর কথা- ২০শে ফেব্রুয়ারীর শুভ ঐশী বাণীর কথা অক্ষরে অক্ষরে হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এতদ্দ্বারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা, ইসলামের সত্যতা এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশিত হতে থাকবে।

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী অথবা নিকটবর্তী সুবিধাজনক দিনে বাংলাদেশের সকল জামাতকে এ দিনটি পালনের জন্যে বলা হচ্ছে। সভা-সমিতি করে এই মহান পুরুষের জীবনী আলোচনা করুন এবং এতে বেশী বেশী নও মোবাইন ও মেহমান বন্ধুগণকে শামেল করার চেষ্টা করুন। নব প্রজন্মকে এ দিনটির গুরুত্ব বুঝাবার জন্যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সুখানুভূতির সাথে সাথে বালক-বালিকাদের জন্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্যে স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ১৫তম সংখ্যা

৩ ফাল্গুন ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ৮ যিলকদ ১৪২০ হিঃ কাঃ
১৫ তবলীগ ১৩৭৯ হিঃ শাঃ ১৫ফেব্রুয়ারী ২০০০ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত

মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা, এর মূল্য কোনক্রমেই অস্বীকার করার অবকাশ নেই। মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন- "ইনসানকে আপান মাদ্‌রী যবান সে এক খাস উনস্ হোতা হ্যা আওর উত্তহ্ ফের উস পর কাদের হোতা হ্যা"- অর্থাৎ মাতৃভাষার সাথে মানুষের এক বিশেষ ভালবাসা হয়ে থাক আর এর উপরে সে দক্ষতা অর্জন করে (মলফুযাত ঃ ২য় খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)। সুতরাং কাউকে সৃষ্টিশীল কিছু করতে হলে মাতৃভাষায়ই তা' করা সম্ভবপর। অন্য ভাষায় সে যতই পাণ্ডিত্য অর্জন করুক না কেন স্বীকৃতি পাওয়া তার জন্যে দুরূহ।

১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী "সবুজ ইশ্‌তেহার" মারফত যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক মহান পুত্র লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আহ্‌মদীয়তের ইতিহাসে ইহা "মুসলেহ মাওউদ" ঘোষণা নামে খ্যাত। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী মহান পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সনে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, [খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)] 'মুসলেহ্ মাওউদ' হওয়ার দাবী করেন। তিনিও মাতৃ ভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্যে জাতিকে যথাসময়ে নসিহত করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর পরই পাকিস্তানে হিজরত করে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ১৯৪৭ সনে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ৬টি নীতি নির্ধারণী ভাষণ দিয়েছিলেন। এর এক ভাষণে তিনি বলেন- "মাদ্‌রী যবান মে তালীম দিই জায়ে, ইসসেলসেলে মে মাশরেকী পাকিস্তান পর জোর না দিয়ে জায়ে কেহ্ ওহ্ জরুর উর্দূকো যারিয়া তা'লীম বানায়ে, ওয়ারনাহ্ ওহ পাকিস্তান সে আলহীদা হো জায়েগা কিউঁকেহ ওহাঁকে বাশিন্দোঁ কো বাংলা যবান সে এক কিস্‌ম কা ইশ্‌ক হ্যায়' অর্থাৎ মাতৃ ভাষায় যেন শিক্ষা দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানীদের যেন বাধ্য করা না হয় যে, অবশ্যই তারা যেন উর্দূকে শিক্ষার মাধ্যম বানায় তা'হলে ইহা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা, সেখানকার বাসিন্দাদের বাংলা ভাষার প্রতি অগাধ ভালবাসা আছে (তারিখে আহ্‌মদীয়ত, ১১ খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা ও দৈনিক আল ফযল, ১৪ই, ডিসেম্বর, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ দ্রষ্টব্য) এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ জাতিকে তখন হুঁশিয়ার করেন যখন দেশের দুই অংশের মধ্যে ভাষা নিয়ে কোন কথাই ওঠে নি। বরং বলা যায় যে, এটা ছিল একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু মহাপুরুষের এ কথাকে উপেক্ষা করে তদানীন্তন সরকার উর্দূ ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পূব পাকিস্তানীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানীরা ক্ষোভে ফেঁটে পড়ে। ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা বাংলার দাবীকে দমনকল্পে আন্দোলনকারী ছাত্র জনতার ওপর তদনীন্তন সরকার গুলিও চালায়। ঢাকার রাজপথ হয় রক্তাক্ত।

ন্যায্য দাবীকে কখনও কেউ রক্ত চক্ষু বা বন্দুকের নল দিয়ে দমিয়ে রাখতে পারে না। তাই ভাষা আন্দোলনকেও দাবীতে দাবাতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হয় এবং এ আন্দোলনের পথ বেয়েই বাঙ্গালী জাতি লাভ করলো একটি রক্তাক্ত সূর্য খচিত সবুজ পতাকা। বাঙ্গালী জাতি বিশ্বের দরবারে খ্যাতিলাভ করলো। আমরা ভাষা সৈনিক ও শহীদদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

গত বছর বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে জাতিসংঘের মাধ্যমে। ইহাও আমাদের গর্ব ও আনন্দের কারণ। এ বছর সারা বিশ্বে ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হবে মহা সমারোহে। একথাও মনে রাখা দরকার যে, ভাষার জন্যে গর্ব ও আনন্দ কোন মূল্য বহন করে না যে পর্যন্ত না ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে বিশ্বের দরবারে অধিষ্ঠিত না করা যাবে।

এখানে উল্লেখ্য, আহমদী জামাত একটি আন্তর্জাতিক জামাত। মাতৃভাষাকে যথার্থ মর্যাদা দেয়ার লক্ষ্যে এজামাতের প্রতিষ্ঠাতা আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে আরবী ভাষায় দোয়ার সাথে সাথে নামাযে মাতৃভাষায় দোয়া করার জন্যে তাগিদ করেছেন। তাছাড়া প্রত্যেক দিন এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে সারা বিশ্বে বাংলায় ৪ বার বিশ্ব সংবাদ পাঠ করা হয়। স্থানীয় ভাষায় জুমুআর খুতবা দেবার প্রথম প্রচেষ্টাও এ জামাতেরই।

নোট ঃ বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর নিকট নিম্নোক্ত ইলহাম হয়েছিলো -

"پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا، اب ان کی دلجوئی ہوگی"

"পহেলে বাঙ্গালা কি নিসবৎ জো কুছ হুকুম জারী কিয়া গিয়া যা আব উনকি দিলজোই হোগী"-

অর্থাৎ প্রথমে বাঙ্গালা দেশ সম্পর্কে যে আদেশ প্রবর্তন করা হয়েছিলো এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে।

যারা এ ইলহাম প্রসঙ্গে কিছু লিখবেন তাদেরকে ইলহামটি হুবহু উদ্ধৃত করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। নচেৎ ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা রয়েছে।

– নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী	ঃ সংগ্রহ ও অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
❑ জুমুআর খুতবা ঃ দেনা-পাওনা সম্বন্ধীয় হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা বশীরুর রহমান	৬
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আহমদী শহীদগণের স্মরণে হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা সালেহ আহমদ	৭-১৩
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (শিক্ষার্থীদের রাজপথ) হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৪-১৫
❑ ৭৬তম ন্যাশনাল সালানা জলসা ঃ	ঃ সচিত্র প্রতিবেদন	১৬-১৭
❑ সালানা জলসার শুভেচ্ছা বাণী	ঃ সংকলনে ঃ সেক্রেটারী, জলসা কমিটি	১৮-১৯
❑ ৭৬তম ন্যাশনাল সালানা জলসার খবরা-খবর	ঃ জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকা	২০-২১
❑ ভারতে আহমদীয়ত	ঃ জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা	২২-২৭
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৮-২৯
❑ হিন্দুধর্ম পরিচিতি ও ইসলামের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম	ঃ জনাব শেখ জোনাব আলী	২৯-৩০
❑ রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঃ মূল জনাব মোহাম্মদ ইসমাঈল মুনীর	ঃ অনুবাদ- জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৩১-৩৪
❑ ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ মূল ঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ (মরহুম)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৫-৩৬
❑ এম.টি.এ ডাইজেস্ট	ঃ সংকলনে - আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক	৩৭
❑ ইসলামী মানব জাতির ধর্ম	ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলে-এ-ইলাহী	৩৮-৩৯

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৬তম সালানা জলসায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, পার্শ্বে মঞ্চে উপবিষ্ট হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা রাজা নাসির আহমদ, নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ এবং জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা, আমীর - পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম।

আহমদী ওয়েব সাইট

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জামাতের একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (ইন্টারনেটের একটি পাতা)-এর অনুমতি দিয়াছে। ইহা জামাতের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বহন করবে। আর জামাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডেও ইহা ব্যবহৃত হবে। ইহা হবে জামাতের একমাত্র ওয়েবসাইট ও কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত। যদি কোন ব্যক্তি বা জামাত এর মধ্যে কোন কিছু সংযোজন করতে চান তাহলে ন্যাশনাল আমীর-এর মাধ্যমে কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। কেন্দ্র যোগ্য মনে করলে ইহা যথারীতি সংযোজিত হতে পারে।

স্বাক্ষর- **রফিক এ হায়াত**
চেয়ারম্যান
ইন্টারন্যাশনাল এম.টি.এ, লন্ডন

শীতবস্ত্র বিতরণ

মহান আল্লাহ্তাআলার ফযলে আমরা গাজিপুর জামাতের পক্ষ থেকে গাজিপুর জামাতের সদস্যদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন রকম কাপড় সংগ্রহ করি এবং জামাতের সদস্য / সদস্যাগণ এই কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রচুর পরিমাণে কাপড় যথা- সোয়েটার, জেকেট, পেন্ট, সার্ট, গেঞ্জি এবং বাচ্চা ও মহিলাদের অনেক রকম কাপড় সংগৃহীত হয়।

অতঃপর ২১-১-২০০০ইং জামাতের পোড়াবাড়ি হালকা এলাকার, গরীব ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এগুলো বিতরণ করা হয়।

- **শেখ মোহাম্মদ আল মাহমুদ**, সেক্রেটারী তবলীগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুর

শুভ বিবাহ

❑ ২৮/০১/২০০০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার মোসাম্মৎ সেলিনা আক্তার, পিতা- মৃত হাতেম আলী, গ্রাম- বানিয়াজান, পোঃ-বলদী আটা, টাঙ্গাইল এর সহিত জনাব ফেরদৌস আহমদ, পিতা-গোলাম হোসেন, গ্রাম ও পোঃ- রমজানবেগ, থানা ও জেলা- মুন্সীগঞ্জ এর বিবাহ ৪০,০০১ টাকা (চল্লিশ হাজার এক টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিবাহের এলান করেন মৌলবী আহমদ তারেক মোবাশ্বের, মোয়াল্লেম। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

❑ গত ১১/০২/২০০০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার মোসাম্মৎ সাহেদা আক্তার, পিতা- মোঃ নুর উদ্দিন, গ্রাম ও পোঃ-ফাজিলপুর, থানা ও জেলা- ফেনী এর সহিত জনাব হাশেম আহমদ, পিতা- জনাব ফয়েজ আহমদ, গ্রাম ও পোঃ- মিঠানালা, থানা- মিরেশ্বরাই, জেলা- চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ১০০০০১ টাকা (এক লক্ষ এক টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিবাহের এলান ও দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আব্দুল কাদির ভুইয়া
সেক্রেটারী রিশ্তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আন'আম-৬

৮০। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

৮১। এবং তার জাতি তার সাথে বিতর্ক শুরু করলো। তখন সে বললো, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করছো ? অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। এবং তোমরা যাকে তাঁর সাথে শরীক করছো তাকে আমি আদৌ ভয় করি না– আমার প্রভু যা চাইবেন তা ব্যতীত। আমার প্রভু জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

৮২। এবং আমি কীরূপে তাকে ভয় করতে পারি যাকে তোমরা (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক করো, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে ভয় কর না, যার সম্বন্ধে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযেল করেন নি ?' যদি তোমরা জান তা হলে বল, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ নিরাপত্তা[৮৬৭] লাভের অধিকতর অধিকারী ?

৮৩। যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত করে নি তারাই এমন লোক যে, তাদের জন্য নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

৮৪। এবং এটাই ছিল আমাদের যুক্তি-প্রমাণ, যা আমরা ইব্‌রাহীমকে তার জাতির[৮৬৮] বিরুদ্ধে প্রদান করছিলাম। আমরা যাকে চাই মর্যাদায় উন্নীত করি; নিশ্চয় তোমার প্রভু পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৮৫। এবং আমরা তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে; আমরা তাদের প্রত্যেককে হেদায়াত দিয়েছিলাম; এবং ইতঃপূর্বে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম নূহকে এবং তার বংশধর থেকে দাউদ এবং সুলায়মান এবং আইউব[৮৬৯] এবং ইউসুফ এবং মূসা এবং হারূনকে। এবং এইরূপে আমরা সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

৮৬। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম) যাকারিয়া এবং ইয়াহ্‌ইয়া এবং ঈসা এবং ইলইয়াসকে; তারা সকলেই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৭। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম) ইসমাঈল এবং আল্‌ইয়াসায়া এবং ইউনুস এবং লূতকে; এবং তাদের প্রত্যেককেই আমরা (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।[৮৭০]

৮৬৭। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী আয়াত নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করে যে, ৭৭-৭৯ আয়াতে বর্ণিত ঘটনা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বেচ্ছাকৃতভাবে যুক্তিরূপেই উপস্থাপন করেছিলেন; কেননা তিনি নিজে একনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং ঐশী-প্রেমে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন।

৮৬৮। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আকাশে ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান বস্তুকে একটির পর একটিকে নিজ প্রভুরূপে মনে করে অবশেষে আল্লাহ্‌তাআলার উপর ঈমান এনে ছিলেন অথবা এই সকল যুক্তির অবতারণা করে তিনি তাঁর জাতিকে আকাশের চন্দ্র ও নক্ষত্রকে খোদারূপে পূজা করার বিপদগামিতা প্রদর্শন করবার জন্য কৌশল অবলম্বন করেছিলেন কিনা সেই প্রশ্নের নিশ্চিত সমাধান বর্তমান আয়াত করে দিয়েছে। এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম থেকে স্পষ্টরূপে এবং অটলভাবে আল্লাহ্‌তাআলার একত্বে বা তৌহীদে বিশ্বাস করতেন, এবং যা তিনি চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছিলেন সেই সমস্ত তাঁর যুক্তি-তর্কের অংশ মাত্র, যা আল্লাহ্‌ই তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

৮৬৯। আইউব (আঃ) বাইবেল কিতাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে উয্ অঞ্চলের বাসিন্দা বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে। কোন কোন নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মতে এটা ইদুমেয়া বা আরবিয়া ডেজার্ট অর্থাৎ আরব মরুভূমি এবং অন্যেরা তাঁর জন্মস্থান মেসোপটেমিয়া বলে নির্দেশ করেছে। তাথেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আরবের উত্তরাঞ্চলের কোন স্থানে উয্ অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে, ইহুদীজাতির মিশর পরিত্যাগের পূর্বে আইউব (আঃ) সেখানে বাস করতেন। অতএব, তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর পূর্বেই সেখানে ছিলেন, অথবা কারো মতে তিনি মূসা (আঃ)-এর স্বদেশবাসী ছিলেন, এবং তাঁর কুড়ি (২০) বৎসর পূর্বে নবুওয়তের মিশন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ইসরাঈলী ছিলেন না, তবে ইসরাঈল-এর বড় ভাই এসাউ (Esau)-এর বংশজাত ছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক বিভিন্নভাবে পরীক্ষিত বহু বৈচিত্রময় জীবন ছিল তাঁর; কিন্তু চরম দুঃখ ও বিপর্যয়ের মুখেও ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সৎ এবং পরম বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনি। মানুষের স্মৃতিপটে আজ পর্যন্ত তিনি ধৈর্যশীলতার পরমোৎকর্ষের আদর্শরূপে জীবন্ত আছেন (ফিউ এনসাইক, ও এনসাইকা অব ইসলাম)।

৮৭০। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দুই আয়াতে হযরত নূহ (আঃ) থেকে উদ্ভূত নবীগণকে ভিন্ন ভিন্ন তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ বিশেষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত নবীগণ হলেন হযরত দাউদ, সুলায়মান,আইউব, ইউসুফ, মূসা এবং হারূন (আঃ) যাদেরকে ক্ষমতা ও উন্নতি দেওয়া হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তাঁরা সমসাময়িক মানব গোষ্ঠীর মঙ্গল সাধনে সক্ষম ছিলেন। এইজন্য এই শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের সদস্যগণকে সৎকর্মশীল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এই জাগতিক শক্তি ও সৌভাগ্য বলে তাঁরা স্বজাতির বাস্তব উপকার করতে সক্ষম ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ) বাদশাহ্ ছিলেন। হযরত ইউসুফ ও মূসা ও হারূন (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকের উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত যাকারীয়া, ইয়াহ্‌ইয়া; ঈসা এবং ইলিয়াস (আঃ) এই নবীগণের মধ্যে কেউ পার্থিব ক্ষমতা অথবা ইহ জাগতিক সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন না; প্রত্যেকে খুবই বিনম্র ও বিনীত এবং অজ্ঞাত জীবন যাপন করতেন। এমনকি, হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হতেন এবং সাধারণতঃ বন-বাদাড়েই থাকতেন। এই বিভাগের বা শ্রেণীভুক্ত নবীগণকে ধার্মিক বা খোদাভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন হযরত ঈসমাঈল, আলআইয়াসায়া, ইউনুস এবং লূত (আঃ) তাঁদের পার্থিব ক্ষমতা ছিল না, আল্লাহ্‌তাআলা তাদিগকে সম্মান এবং মর্যদায় ভূষিত করেছিলেন। ক্ষমতা এবং ধনলিপ্সার দুর্নামও রটনা করা হ'ত তাদের সম্পর্কে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্বন্ধে বাইবেলে আমরা দেখি, "'তিনি বন্য মানব হইবেন, তাঁহার হাত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে উদ্যত হইবে এবং প্রত্যেক মানুষের হাত তাঁর বিরুদ্ধে" (আদিপুস্তক-১৬ঃ১২)। হযরত আল্‌ইয়াসায়া সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিবার মতলবে এক রাজাকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করার জন্য হত্যা করেছিলেন। ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, তিনি আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ায় তিনি অপদস্থ হয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা তিনি নাকি ক্ষমতার অভিলাষ করেছিলেন। হযরত লূত (আঃ)-এর নামে অপবাদ রটানো হয় যে, অন্যায়ের উর্বর চারণভূমির লালসা করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞাতি ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে সর্বদা ফ্যাসাদ করতেন। এহেনভাবে উক্ত নবীগণ সম্পর্কে ধনসম্পদ এবং ক্ষমতা লিপ্সার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাপবিত্র গ্রন্থ কুরআন এই সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে ঘোষণা করে বলেছে যে, তাঁরা আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত বান্দা ছিলেন যাঁদিগকে তিনি গৌরবান্বিত করেছিলেন।

হাদীস শরীফ

কুরআন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝

অর্থ ঃ এবং এই কুরআনের যা কিছু আমরা ধীরে ধীরে নাযেল করি উহা মু'মিনগণের জন্য আরোগ্য এবং রহমত বিশেষ; কিন্তু ইহা যালেমদেরকে কেবল ক্ষতিতেই বৃদ্ধি করে।

হাদীস ঃ

মান ক্বারাআ হারফাম মিন কিতাবিল্লাহে হাসানাতুন ওয়াল হাসানাতু বেআশরে আমসালেহা লা আকুলু আলিফলাম মিম হারফুন, আলিফ হারফুন ওয়া লামু হারফুন ওয়া মিমু হারফুন।

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করে তার জন্য পুণ্য রয়েছে আর এই পুণ্য দশটি পুণ্যের সমান। আমি আলিফ লামকে একটি অক্ষর বলি না, আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মিম একটি অক্ষর। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্তাআলা মানব জাতিকে একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান দান করেছেন। এর মধ্যে মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে ও পূর্ণাঙ্গীণভাবে বর্ণনা করা আছে। মানুষ যদি গভীর মনযোগে কুরআন পাঠ করে ও এর উপর আমল করে তবে সে ফিরিশ্তাদের মত হতে পারে। কুরআন পাঠ করে শুধু নিজের সংশোধন হয় না বরং ইহার পাঠের জন্য আল্লাহ্ পুণ্যও রেখেছেন। কুরআন মানুষকে আল্লাহ্র প্রকৃত দাস বানায়। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) বলেন,

"আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় এ (পবিত্র কুরআন) একটি অনন্য মুক্তো। এর বাইরে আলো, এর ভিতরে আলো, এর উপরে আলো এর নীচে আলো, এবং এর প্রতিটি শব্দে আলো। এ এক আধ্যাত্মিক বাগান, এর থোকা থোকা ফল নাগালের মধ্যেই। এর মধ্য দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। সৌভাগ্যের প্রতিটি ফল এর মধ্যে পাওয়া যায়। এর দ্বারাই প্রতিটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। এর আলো আমার এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এই আলো আমি আর অন্য কোন উপায়েও সংগ্রহ করতে পারতাম না। আল্লাহ্র কসম ! যদি কুরআন না থাকতো তাহলে আমি জীবনে কোন আনন্দ পেতাম না" (আয়েনায়ে কামালতে ইসলাম, পৃঃ ৫৪৫)।

আমাদের জীবনের লক্ষ্য খোদার সন্তুষ্টি আর এই সন্তুষ্টি অর্জনের পথ হলো কুরআন। আসুন আমার কুরআনকে নিজেদের জীবনের স্পন্দন করি। আল্লাহ্ করুন আমরা সবাই ইহার উপর আমল করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করি, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা – মাওলানা সালেহ্ আহমদ,

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

জনাব মওলানা আব্দুল করীম (রাঃ) হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র বাণী সম্বন্ধে বলেছেন ঃ জলন্ধর শহরে এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন - "পৃথিবীতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কী" ? উত্তরে তিনি বললেন, "আমি এই জন্যে এসেছি যাতে মানুষ একীনের (বিশ্বাসের) শক্তিতে উন্নতি লাভে সমর্থ হয়।"

জলন্ধরের আরও একটি ঘটনা ঃ

মুন্সী মুহাম্মদ আরোড়া সাহেবকে আমাদের জামাতের এক ভাই প্রশ্ন করেন, "ঈমান কয় প্রকার" ? উত্তরে তিনি যা বললেন তা অতি সহজ ও সরল। বলেছেন – 'ঈমান দুই প্রকারের হয়ে থাকে। মোটা ও হালকা, মোটা ঈমান হ'ল। - "সাদাসিদে ও সরল জীবন-যাপন করা আর হালকা ঈমান হচ্ছে আমার চলার পথ অনুসরণ করা।"

বয়াত ও তওবা ।

কাদিয়ানে সাপ্তাহিক ধর্মীয় আলোচনা সভায় জনাব মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে বলতে শুনেছেন- বয়াত সম্বন্ধে জেনে রাখা উচিত যে, এতে কী উপকারিতা রয়েছে এবং কেন এর (বয়াতের) প্রয়োজন ? কোন জিনিসের উপকারিতা ও মূল্যবোধ না জানা পর্যন্ত এর মর্যাদা চোখে ধরা পড়ে না। যেমন ঘরে মানুষের বিভিন্ন রকমের জিনিস ও মালপত্র থাকে। যেমন টাকা-পয়সা কড়ি-খড়ি ইত্যাদি। তখন জিনিসের গুরুত অনুযায়ী উহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। একটি কড়ির হেফাযতের জন্য ওরূপ ব্যবস্থা করতে হয় না- টাকা-পয়সার জন্য যেরূপ করতে হয়। কাঠ-খড়ি ও তো এমনিই এক কোণে রেখে দেয়া হয়। যে জিনিস নষ্ট হলে মানুষ নিজেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে, সে বিশেষভাবে সেই জিনিসের হোফাযতের ব্যবস্থা করবে। অনুরূপভাবে বয়াতের ব্যাপারে প্রধান কথা হলো, 'তওবা' "যার অর্থ হলো 'প্রত্যাবর্তন'। অতএব এটা হলো সেই অবস্থার নাম যখন মানুষ পাপকর্মে বিশেষ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং এটাকেই সে নিজের আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়। এখন তওবার অর্থ হলো, "সেই আবাস তাকে ছাড়তে হবে, এবং প্রত্যাবর্তনের অর্থ হল, "পবিত্রতা অবলম্বন করা।" নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও তাতে অনেক দুঃখ হয়। নিজের আবাস ছেড়ে যেতে মানুষ কতনা কষ্ট অনুভব করে! নিজের আবাস ছেড়ে যেতে হলে তার সব বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে হয়। সব জিনিস যেমন খাট, গালিচা, প্রতিবেশী, অলি-গলি হাট-বাজার সবকিছু ছেড়ে এক নতুন দেশে তাকে যেতে হয়। অর্থাৎ তার পূর্বের আবাসভূমিতে কখনো ফিরে আসে না। এরই নাম হচ্ছে "তওবা"। পাপের বন্ধু এক প্রকার, আর তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার) বন্ধু হলো অন্য প্রকার। সাধু ব্যক্তিগণ এই অবস্থাকে 'মৃত্যু' বলে অভিহিত করেছেন। তওবাকারীকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। এবং প্রকৃত তওবার ক্ষেত্রে তাকে বড় বড় বাধা ও বিপদাবলীর সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ্তাআলা দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ - শুভ পরিণাম দান না করে তিনি তাকে মৃত্যু দেন না। "ইন্নল্লাহা ইউহিব্বুত্তাওয়াবীনা"তে (নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীদেরদের ভালবাসেন) এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে তওবা করে নিঃস্ব ও নিসংঙ্গ হয়ে যায়। একারণেই আল্লাহ্তাআলা তাকে ভালবাসেন ও স্নেহ করেন এবং পুণ্যবানদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। অপর জাতি খোদাকে দয়ালু স্নেহপরায়ণ মনে করে না। খৃষ্টানগণ খোদাকে যালেম (অত্যাচারী) বলে মনে করে এবং ছেলেকে (ঈসা-কে) দয়ালু (মনে করে)। কেননা, বাপতো-পাপ ক্ষমা করে না আর ছেলে নিজের জীবন দিয়ে ক্ষমা করিয়েছে। কত বড় বোকামী ! বাপ ও ছেলের মধ্যে এতো ব্যবধান ! পিতাপুত্রের স্বভাব চরিত্রের মধ্যে তো সামঞ্জস্য হয়ে থাকে (কিন্তু এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত)। আল্লাহ্ দয়ালু না হলে মানুষ এক দন্ডও বেঁচে থাকতে পারতো না। মানুষের কোন কর্ম ও শ্রমের পূর্বাহ্নেই যিনি তার জন্য উপকারী অগণিত জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন– সে ক্ষেত্রে কি এটা ধারণা করা যায় যে, তার তওবা ও কর্মকে তিনি গ্রহণ করবেন না ?" (মলফুযাত ঃ ১ম খন্ড, ৩পৃঃ, সন ১৮৯৫)।

অনুবাদ - মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত
ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর একটি ইলহাম- "তেরি উকদাকুশাই হুশিয়ারপুর মে হোগী"-অনুযায়ী কাদিয়ান হতে হুশিয়ারপুর গমন করে নির্জনে ৪০ দিন (চিল্লাকশি) আরাধনায় থেকে আল্লাহ্তাআলার নিকট বিশেষভাবে দোয়া করেন এবং দীনে ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য সর্বশক্তিমান খোদার নিকট নিদর্শন কামনা করেন। উহার উত্তরে আল্লাহ্তাআলার তরফ হতে তাঁর নিকট সুদীর্ঘ শুভ সমাচার আসে। উহার মধ্যে তাঁকে ইসলাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে অসাধারণ অদৃশ্যের বিপুল সূক্ষ্ম সংবাদ জানানো হয় এবং উহার মধ্যেই মুসলেহ্ মাওউদ তথা মহান সংস্কারক পুত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত সুসমাচার দেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ সকল ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি প্রচার লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এর নাম হলো **সবুজ ইশ্তেহার**। উহার জরুরী অংশগুলো নিম্নে দেওয়া হল।

মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আকদস (আঃ) বলেনঃ

"পরম কারুণিক, পরম দাতা মহিমান্বিত খোদা যিনি সর্বশক্তিমান- যাঁর মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধনপূর্বক বলেনঃ

"আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।

নিদর্শনের উদ্দেশ্যেঃ

খোদা বলিয়াছেন, "যাহারা জীবন-প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্তাআলার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যাহা ইচ্ছা করি, করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতী জন্মে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যাহারা অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কেতাব তাঁহার রসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।"

মুসলেহ্ মাওউদের অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলীঃ

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান হইবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে....।

তাহার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে কলেমাতুল্লাহ্-আল্লাহ্র বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয় পুত্র।

মাযহারুল হাক্কে ওআল উলা কায়ান্নাল্লাহা
নাযালা মিনাস্ সামায়ে

অর্থাৎ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে; জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। -ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া (অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্র অটল মীমাংসা) (ইশ্তেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী)।

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ-ও ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্মলাভ করবে। সুতরাং এই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 'শুভ সোমবার' প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশ্তেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁর জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ করেন যে, মুসলেহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হন। তাঁর ৫২ বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফতকালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তিনি নিজেও আল্লাহ্তাআলার নিকট হতে ইলহামপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ্ মাওউদ হবার দাবী করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ইসলাম প্রচার কেন্দ্রসমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামাত এবং তাঁর লিখিত কুরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর, (তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর) জ্ঞান ও তত্ত্ব-পূর্ণ অসংখ্য পুস্তক, খুৎবা ও বক্তৃতা এবং তাঁর দ্বারা জামাত ও নেযামে খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার জীবন্ত দর্শনকে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল রাখছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার স্বাক্ষর হয়ে আছে ও থাকবে, ইনশাল্লাহ্ (পুনঃপ্রকাশিত)।

মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

জুমুআর খুতবা

দেনা পাওনা সম্বন্ধীয়

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত খুতবা জুমুআ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ মজসিদে ফযল, লন্ডন]

"ঋণ আদায়ের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। প্রত্যেক প্রকারের খেয়ানত ও বেঈমানী থেকে দূরে থাকা উচিত। হযরত রসূলে করীম (সঃ) ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়তেন না।"

হযরত আমীরুল মু'মিনীন তাশাহ্হুদ তা'আওউয ও সূরাতুল ফাতিহাহ্ পাঠের পর সূরাতু আলে ইমরানের ৭৬নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّٖنَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

অর্থাৎ- আহলে কিতাবের মধ্য থেকে কেউ কেউ এমন আছে যার কাছে তুমি রাশীকৃত ধন-সম্পত্তি রাখলেও সে তা তোমাকে ফেরৎ দিয়ে দেবে, তাদের মধ্যে আবার কেউ এমনও আছে যার কাছে তুমি এক দীনার আমানত রাখলেও সে তা তোমাকে ফেরৎ দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তার (মাথার) উপর দাঁড়িয়ে থাক। ইহা এজন্য যে, তারা বলে নিরক্ষরদের ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ত নেই, এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

আমি এ বিষয়ে নবী (সঃ)-এর কতক হাদীস নির্বাচন করেছি। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে যত খুত্বা হয়েছে তাতে যেহেতু অধিকাংশই এসে গেছে তাই এখন সেসবের পুনরাবৃত্তির সময়ও এসে গিয়েছে। পূর্বে আমার পদ্ধতি এই ছিল যে, সাধারণ মানুষ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলকে বুঝানোর জন্য হাদীসগুলির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথা যা হাদীসগুলোর ব্যাখ্যাই হ'ত, সেসবেরও দীর্ঘ ব্যাখ্যা করতাম। যেহেতু সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি হয়ে গেছে সেহেতু এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করব। আমি বিশ্বাস করি যে, সংক্ষেপেই এ সংবাদ পৌঁছে যাবে। আমি জানিনা আমার পূর্বে কখনও কোনও খলীফা এত ধারাবাহিকভাবে খুতবা দিয়েছেন যা থেকে কদাচিৎ কোন বিষয় বাদ পড়েছে কিনা ? এ জন্য যেসব বিষয় জামাতকে বুঝানো আবশ্যক ছিল তা যতটা সম্ভব আমি বুঝিয়েছি।

এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমি এখন হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করছি। তিনি (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষের নিকট থেকে সম্পদ নেয় আল্লাহ্তাআলা তার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেবেন"।

এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। যে ফেরৎ দেয়ার উদ্দেশ্যে সম্পদ নেয় আল্লাহ্তাআলা তাকে সে সম্পদ ফেরৎ দেয়ার সামর্থ্য দিয়ে থাকেন।

"এবং যে ব্যক্তি সেই সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আল্লাহ্তাআলা তাকে ধ্বংস করে থাকেন" (বুখারী, কিতাবুল ইসতেকরায ওয়া আদাদ্দাইয়ুন বাবও আদায়েদ্দায়নে)।

আপনারা সবই জানেন এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, নিয়্যতের উপর অধিকাংশ ফল নির্ভরশীল। সম্পদ এ উদ্দেশ্যে নেয়া হয় যে, সামর্থ্যানুযায়ী অবশ্যই পরিশোধ করব। তাহলে আল্লাহ্তাআলা সামর্থ্য বৃদ্ধি করেন। খাওয়া-দাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি নেয়া হয় তাহলে সে সম্পদ অপচয় হয়ে থাকে, এহেন অবস্থায় তার দীন, দুনিয়া কিছুই থাকে না।

ওরবা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নামাযে এই দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! আমি পাপ এবং ঋণ থেকে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা চাই। কোন জিজ্ঞাসাকারী নিবেদন করল, হে আল্লাহ্র রসূল ! ঋণের ব্যাপারে আল্লাহ্তাআলার কাছে এত ব্যাপক আশ্রয় চাচ্ছেন কেন ? এ প্রেক্ষিতে আঁ হযরত (সঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্থ হয় তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে (বুখারী-কিতাবুল ইসতেকরায ওয়া আদাদ্দাইয়ুন বাবও মান ইসতেযাযা মিনাদাইন), এ-ও মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, যে ব্যক্তি বস্তুতঃ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঋণ নেয় তবে সে অবশ্যই মিথ্যা বলে এবং ওয়াদাও ভঙ্গ করে। একটি অপরাধ আরেকটি অপরাধকে পথ নির্দেশ করে।

এখন আমি মলফুযাত থেকে ঋণ আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। বর্ণনা হ'ল, এক ব্যক্তির কাছে আরেক ব্যক্তির আমানত গচ্ছিত ছিল সে তা নিয়ে কোথাও চলে গেল। [মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন] 'ঋণ আদায় ও আমানত ফেরতে অল্প সংখ্যক মানুষই বিশ্বাসী হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষ এতে ভ্রুক্ষেপ করে না। অথচ এটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। হযরত রসূলে করীম (সঃ) ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়াতেন না।"

অনেক সময় এমন হয়েছিল যে, কারও ঋণ ছিল কিন্তু অন্য কোন সাহাবী তার ঋণ পরিশোধ করেছেন তারপর তিনি (সঃ) তার জানাযার নামায পড়িয়েছেন। এছাড়া যদি এমন কেউ হতো যার ঋণ পরিশোধকারী পাওয়া যেত না আর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও সমস্ত ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য রাখত না তাহলে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) তার জানাযা পড়াতেন না।

"দেখা যায় যে, মানুষ যেমন নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে ঋণ নিয়ে থাকে ততটা প্রফুল্লতার সাথে ফেরৎ দেয় না, বরং ফেরৎ দেয়ার সময় কিছু না কিছু কার্পণ্য অনুভব করে।" ফলে যে সম্পর্ক আছে তা নষ্ট হতে থাকে। "এ থেকে ঈমানের যথার্থতা পরীক্ষিত হয়।"

হুযূর (আঃ) আরও বলেন, তওবা ইস্তিগফার করতে থাক, কেননা, আল্লাহ্র এ ওয়াদা রয়েছে যে, যে ইস্তিগফার করে তার রিয্কের ব্যাপকতা দেয়া হয় (মলফুযাত, নতুন সংস্করণ, ৫ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)।

"আমাকে পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, অনেক ব্যক্তি এ বিষয়গুলির পরওয়া করে না। আমাদের জামাতেও এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজেদের ঋণ পরিশোধে কম দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। এটি ইনসাফের পরিপন্থী আঁ হযরত (সঃ) তো এমন এমন মানুষের (জানাযা) নামায পড়াতেন না। সুতরাং তোমাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকে যেন এ বিষয়টিকে ভালভাবে স্মরণ রাখে যে, ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আলস্য না দেখায়। প্রত্যেক প্রকারের বেঈমানী ও খেয়ানত থেকে দূরে থাকা উচিত। কেননা, এটি ঐশী বিষয়ের পরিপন্থী। যা তিনি (আল্লাহ্) এ আয়াতে (শিক্ষা) দিয়েছেন" (মলফুযাত, নতুন সংস্করণ, ৪র্থ খন্ড, ৬০৭ পৃষ্ঠা)।

অনুবাদ - **মাওলানা বশীরুর রহমান**, সদর মুরব্বী

জুমুআর খুতবা

আহমদী শহীদগণের স্মরণে

[হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত খুতবা জুমুআ, ২৫শে জুন, ১৯৯৯, মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরাতুল ফাতিহার তেলাওয়াতের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৫৪ নম্বর হতে ১৫৫ নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এবং যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করে তোমরা তাদের মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।

শহীদদের সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে যে খুতবা চলছে উহাই আজকের খুতবার বিষয়-বস্তু, (জামাতের) আর্থিক বছর যেহেতু শেষ হতে যাচ্ছে তাই আমাকে বলা হয়েছে যে, (আজকের খুতবার মাধ্যমে) আমি যেন জামাতকে স্মরণ করিয়ে দেই যে, তারা যেন আর্থিক বছর শেষ হবার পূর্বেই নিজ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেন। এবং যা কিছু ঋণ রয়েছে (আল্লাহ্‌র রাস্তায় চাঁদা) তা যেন পরিশোধ করে দেন। **জীবন ও মরণ তো আল্লাহ্‌র হাতে তাই তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাথে হিসাব পরিষ্কার রাখাই উত্তম।** এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দু'একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করছি। তিনি (আঃ) বলেন, "সুতরাং তোমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত প্রত্যেককে আমি তাকীদ সহকারে বলছি যে, নিজ ভাইদের চাঁদা সম্বন্ধে অবগত কর, প্রত্যেক দুর্বল ভাইকে চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত কর। এ সুযোগ ফিরে পাবার নয়," তিনি আরো বলেন, "ইহা পরিষ্কার যে, তোমরা দু'টি বস্তুকে ভালোবাসতে পারো না, তোমরা সম্পদকেও ভালোবাসবে এবং খোদাকেও ভালোবাসবে তা সম্ভব নয়, শুধু একটিকেই ভালোবাসতে পারো। সুতরাং সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে খোদাকে ভালোবাসে। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে খোদাকে ভালোবেসে তাঁর রাস্তায় অর্থ খরচ করবে আমি নিশ্চিত যে, তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় অধিক বরকত দেয়া হবে। কেননা, অর্থ নিজে নিজে আসে না বরং খোদার ইচ্ছায় এসে থাকে। সুতরাং যে খোদার জন্য সম্পদের এক অংশ ত্যাগ করে সে অবশ্যই উহার প্রতিদান পাবে।"
(মাযমুআ ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭)

এই সংক্ষিপ্ত তাহরীকের পর এবার আমি ঐ সকল শহীদদের উল্লেখ করছি যারা তৃতীয় খেলাফতের সময়ে শহীদ হয়েছেন। সর্বপ্রথমে **মাষ্টার গোলাম হোসেন সাহেব** পিতা আব্দুল করীম বাট, সাহেবের (শাহাদতের) কথা বলবো। শাহাদতের

তারিখ হলো অক্টোবর ১৯৬৭। তিনি অধিকৃত কাশ্মীরের তারাকপুরা বান্ডিপুরা হতে ১৯৪৯ বা ১৯৫০ সনে হিজরত করে গিলগিটে আসেন। এখানে কয়েক বছর মরহুম সানাউল্লাহ্ সাহেবের নিকট চাকুরী করেন। অতঃপর গিলগিটেই স্কুল শিক্ষক হিসেবে চাকুরী নেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। গিলগিটে হতে বদলী হয়ে তিনি চালাস চলে যান। সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সনে তিনি চালাস হতে বিশ পঁচিশ কিলোমিটার দূরে থোর নালাতে বদলী হন। সেখানে আহমদী হবার কারণে তার বিরোধিতা হয়। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সনের অক্টোবর মাসে যখন তিনি স্কুলের আবাসস্থলে অবস্থানরত ছিলেন, রাতে তার উপর আক্রমণ চালানো হয়। বিরুদ্ধবাদীরা নামাযে রত অবস্থায় জায়নামাযেই তাকে যবাই করে শহীদ করে। এভাবে একজন সরল, নেক প্রকৃতির, নরম হৃদয়ের অধিকারী তাহাজ্জুদগুজার নিষ্ঠাবান আহমদী এ দুনিয়া হতে বিদায় নেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। আক্রমণকারীগণ তাকে শহীদ করার পর তার (শবদেহকে) থোর নালাতে ভাসিয়ে দেয়। নাসেরাবাদ মহল্লার মোকাররম খাজা বারকাত আহমদ বর্ণনা করেন যে, ঐ সময়ে আমি থোর নালাতে যাই। স্থানীয় (গ্রাম্য সর্দার) শেরগাজীর সহায়তায় মরহুমের শবদেহের সন্ধান হয়। চালাসের পুলিশকেও সংবাদ দেয়া হয়েছিল। তারাও সঙ্গে ছিল। স্কুল হতে এক কিলোমিটার দূরে একটি গভীর স্থানে (তার শবদেহের) শুধু পায়ের আঙ্গুল দেখা যায়। দেহ গলে গিয়েছিলো লাশ বের করে স্কুলের চৌহদ্দীতেই তাকে দাফন করা হয়। অপরাধীরা ধরা পরে। কিন্তু সামান্য শাস্তির পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। **পৃথিবীতে অনেক সময়ে শাস্তি দেয়া হয়। আর এ দুনিয়ার কঠোর শাস্তি ঐ শাস্তির তুলনায় অনেক কম যা কিয়ামতের দিন খোদার তরফ হতে দেয়া হবে।** তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তার ছোট ভাই মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব অধিকৃত কাশ্মীরে মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে কাজ করছেন।

'চক হাসান আরাঈ' নিবাসী **মোকাররম চৌধুরী হাবীবুল্লাহ্ সাহেব**। শাহাদতের তারিখ ১৩ই জুন, ১৯৬৯। তিনি পাঁচ বোনের মধ্যে এক ভাই ছিলেন। পরিবারের মধ্যে একাই আহমদী ছিলেন। এ কারণে

আত্মীয়বর্গসহ গোটা গ্রাম তার বিরোধিতা করত। আহমদীয়ত গ্রহণ করার কারণে তার মাতা-পিতা তাকে ঘর হতে বের করে দেয়। এর পর তিনি শাহিওয়ালে আত্মীয়তা সম্পর্কের এক ভাই-এর নিকট চলে আসেন। সেখানে তিনি মেহনত মজুরী করতেন। কিছু দিন পর তার মাতা তাকে তার গ্রাম 'চক হাসান আরাঈ' তহসীল আরেফ ওয়ালা, জেলা পাক পতনে নিয়ে যান। তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন চাপ দিতে লাগালো যে, তিনি যেন আহমদীয়ত ছেড়ে দেন। এ অপরাধে তাকে প্রায়ই মার-ধর করা হতো। তথাপি তিনি বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা ও আহমদীয়ত হতে বিরত হন নি।

ইতোমধ্যে তার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি তার পিতার দাফন কাফনের পূর্ণ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অআহমদী পিতার নামাযে জানাযা পড়েন নি যদ্ধরুন তার অআহমদী চাচা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ভীষণ গণ্ডগোল করে, এর পর হতে প্রকাশ্যে বিরোধিতা হতে থাকে। এ গ্রামের মৌলভীকে তিনি কয়েকটি বহসে নিরুত্তর করে দিয়েছিলেন। সে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণে সবাইকে ভড়কে দেয়। এই (মৌলভী) তার চাচাতো ভাইদের সাথে মিলে পরিকল্পনা করতে লাগালো। তিনি শরীয়ত অনুযায়ী পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের বোনদের মাঝে বন্টন করে দিলে তার চাচাতো ভাইয়েরা অসন্তুষ্ট হলো এবং বলতে লাগলো তুমি তাদের (বোনদের) মাথায় উঠিয়ে দিয়েছো। তিনি উত্তরে কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিলে তারা বললো, তুমিতো মির্যায়ী, তুমি শরীয়তের কথা কি জানো। নিজ গ্রামের নিকটেই কবুলাতে তার বুক ডিপো ছিলো। তিনি কবুলা জামাতের ইমামুস্ সালাত ছিলেন। তিনি দৈনন্দিন ও জুমুআর নামায কবুলাতেই আদায় করতেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৩ই জুন, ১৯৬৯ সনে কবুলাতে জুমুআর নামায আদায় করে গ্রামে আসলে তার স্ত্রী বললেন, আজ ক্ষেতে যাবেন আমি শুনেছি বিরুদ্ধবাদীরা আপনার সাথে লড়াই করার পরিকল্পনা করে রেখেছে। কিন্তু তিনি বললেন, যখন আমি লড়াই করব না তো তারা কীভাবে লড়াই করবে, সুতরাং তিনি খালি হাতে নিজ জমিতে চলে যান। শুক্রবারের দিন তার জমিতে (সেচ প্রকল্পের) পানি দিবার দিন ছিল। কিন্তু তার বোন জামাই ঐ পানি নিজ জমিতে দিতে শুরু করে, তিনি গিয়ে তা দেখলেন তার এক চাষী এই সব দেখে রাগান্বিত হচ্ছিল তিনি তাকে বললেন, এই জমিওতো আমাদের, তাদের পানি দিতে দাও। এই বলে তিনি ঐ নালার পানিতে ওযু করতে শুরু করলেন। আসরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি ওযূ করে নিজ জমিতে যাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে তার চাচাতো ভাই ও অন্যান্য কয়েকজন বিরোধী তাড়া করে লাঠি সোটা দ্বারা তাকে আক্রমণ করে। তিনি লাঠি খেলায় পারদর্শি ছিলেন। তাদের একজনের হাত হতে লাঠি কেড়ে নিয়ে তিনি নিজের হিফাযত করতে লাগলেন। তার বোন জামাই এ দেখে বল্লম দ্বারা তাকে আঘাত করে। বল্লম তার পেটে লাগে এবং তিনি গুরুতরভাবে আহত হন, তার এক আত্মীয় সম্পর্কের ভাই তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে সে-ও বল্লম দ্বারা আহত হয়। তিনি যখন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে ছিলেন সে সময়ে নেক বিবি নামে খ্যাত তার এক মহিলা আত্মীয়া, যে মুনাফিক ছিল এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসে শহীদ মরহুমের মুখে গ্লাস লাগিয়ে দেয় এবং বলে তুমি এই দুধ পান কর। মরহুম শহীদ কয়েক চুমুক দুধ পান করেন। লোকেরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল পথিমধ্যে তিনি মারা যান। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল এক চল্লিশ বছর। পরবর্তীতে পোষ্ট মর্টেম তদন্তে জানা যায় যে, নেক বিবি নামক মহিলাটি দুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। পোষ্ট মর্টেমে এই বিষ ধরা পড়ে।

দুষ্কর্মের ফল ঃ যে মহিলাটি শহীদ মরহুমকে দুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল সে পরবর্তীতে পাগল হয়ে যায়। মানুষ তার কাছেও যেত না। এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় এবং গোসল ছাড়াই তাকে দাফন করা হয়। অন্যান্য অপরাধীদের অবস্থা জানা যায় নি।

তিনি মারা যাবার সময় বিধবা মরিয়ম সিদ্দীকা বেগম ও তিন কন্যা ও চার পুত্র রেখে যান। তিন কন্যা মোকাররমা আমাতুস সালাম সাহেবা, মোকাররমা খালেদা পারভীন সাহেবা ও মোকাররমা আনসাতালাআত সাহেবা বিবাহিতা। এক পুত্র মোহাম্মদ ইকবাল সাহেব লাহোরে ইলেক্ট্রোনিক্স এর ব্যবসায় করেন এবং বিবাহিত। দ্বিতীয় পুত্র মোকাররম ওয়াসীম আহমদ সাহেব রাবওয়াতে কাঠের ব্যবসা করেন তিনিও বিবাহিত। তৃতীয় পুত্র মোকাররম নাসের আহমদ জাফর সাহেব ফযলে উমর হাসপাতাল রাবওয়াতে কেশিয়ার এবং তিনি অবিবাহিত। চতুর্থ পুত্র মুকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেব গুডস ট্রান্সপোর্টের ব্যবসায় করেন। তিনি রাবওয়াতে থাকেন এবং অবিবাহিত। শহীদ মরহুম জাপানের প্রাক্তন মুবাল্লেগ মোকাররম জিয়াউল্লাহ্ মুবাশ্বের সাহেবের খালু ছিলেন।

কোয়েটা নিবাসী **শহীদ মুকাররম সৈয়্যদ মাওলুদ আহমদ** বুখারী পিতা সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ সাহেব ঃ

শাহাদতের তারিখ ৯ই জুন, ১৯৭৪। ১৯৭৪ সনের জুনের প্রারম্ভ হতেই মৌলভীগণ নিজেদের মসজিদসমূহে আহমদী বিরোধী উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখতে শুরু করে। এ সময়ে সৈয়্যদ মাওলুদ আহমদ পিতা-মাতার সাথে কোয়েটার নিকটে একটি গ্রামে থাকতেন। দিনের বেলায় স্কুলে চাকুরী করতেন এবং রাতে পড়তেন। বিএ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, জুনের আট তারিখে তার ঘরের নিকটবর্তী মসজিদে মুফতী মাহমুদ উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান করে। সুতরাং ৮ ও ৯ই জুনের মধ্যবর্তী রাতে কয়েক ব্যক্তি দেয়াল ডিঙ্গিয়ে উঠানে প্রবেশ করে। সে সময়ে শহীদ মাওলুদের চোখ খুলে যায়। তার ডাকাডাকিতে তার বোন সীমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে চোর এসেছে মনে করে চিল্লাচিল্লি শুরু করে। এ সময়ে উঠানের পাশে অবস্থিত ষ্টোর রুম হতে এক ব্যক্তি যে পায়খানায় লুকিয়ে ছিল সে-ও পালায়। তৃতীয় ব্যক্তি যে উঠানে ছিল উঠানের দরজা খুলে পালিয়ে যায়। ইতোমধ্যে ঘরের অন্যান্য সদস্যরা জেগে উঠে। শহীদ মরহুম ও তার ভাইয়েরা মনে করে এরা চোর তাদের ধরা উচিত, সুতরাং তারা সামনের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময়ে পাশের একটা গলি হতে সাত জন দুষ্কৃতকারী বেরিয়ে সামনে আসে। একজন মাওলুদ আহমদকে বগলে হাত দিয়ে কোমরের দিকে ধরে রাখে। অন্যান্যরা তাকে ছুরিকাহত করে মারাত্মকভাবে আহত করে।

শহীদের বড় ভাই ডাঃ সৈয়্যদ মাকসুদ আহমদ সাহেব এবং সর্বকনিষ্ঠ ভাই সৈয়্যদ মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবের উপরও ছুরি দ্বারা আক্রমণ করে এবং তাদের আহত করে। ইতোমধ্যে উনার মা ও বোন সেখানে পৌঁছান। এ সময়ে শহীদ মাওলুদ আঘাতের তীব্রতা সহ্য না করতে পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলেন। তারা তাকে ধরে উঠিয়ে নেন এবং তিন জনকেই ঘরে নিয়ে যান। শহীদের দেহে একুশটি আঘাত করা হয় যা বুকে ও বগলে ছিল। বুক ঝাঁঝড়া হয়ে গিয়েছিল। হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছিল। বাকী দুইজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তাদের অপারেশন হয়। ডাক্তার মাকসুদ সাহেবকে দুই ব্যাগ ও সৈয়্যদ মুজাফ্ফর আহমদকে চৌদ্দ ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়। শাহাদতের সময় মাওলুদের বয়স আঠারো ছিল। পুলিশের নির্দেশে শহীদ মাওলুদকে কোয়েটার আহমদী মসজিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। সৈয়্যদ মাওলুদ আহমদ অবিবাহিত ছিলেন। তার বড় ভাই সৈয়্যদ মাকসুদ আহমদ সাহেব এ সময় জামাতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছোট ভাই সৈয়্যদ মাশুদ আহমদ সাহেব আজকাল জাপানে আছেন এবং বিভিন্ন পদে জামাতের খেদমত করছেন। সর্বকনিষ্ঠ ভাই সৈয়্যদ মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবও জামাতের খেদমত করছেন। বড় বোন আমাতুর রশীদ আঞ্জুর ও ছোট বোন মোকাররমা আমাতুল করীম সীমা সাহেবা লাহোরের সামানআবাদে থাকেন।

শহীদের উপর আক্রমণকারী সংখ্যায় সাতজন ছিল। কিছু দিন পর আক্রমণকারীদের দুইজনের দুপুর বেলায় এক হোটেলে বচ্সা হয় তারা রাস্তায় বেড়িয়ে একে অপরের উপর ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দু'জনই আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। পুলিশ এসে যখন তাদের উঠায় তো একজনের মাথা চামড়ার সাথে ঝুলছিল আর অপরজন হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মারা যায়। চতুর্দিকের লোক ও পথচারীগণ এ দৃশ্য দেখেছে। শহীদ মাওলুদ আহমদের উপর আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন আক্রমণের সময় নিজেদের ছুরি দ্বারাই অন্ধকারের কারণে ছুরিকাহত হয়। পরবর্তীতে গোপনে তাকে চিকিৎসার ভালো সুবিধাদি না পাবার কারণে তার ক্ষত দুষ্টক্ষতে পরিণত হয় আর এতেই তার মৃত্যু হয়।

(শহীদ মরহুমের বোন আমাতুল করীম সীমা সাহেবার প্রেরিত পত্রের সংক্ষেপ)

মুকাররম মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন ভাট্টি সাহেবের শাহদতের ঘটনা

শাহাদতের তারিখ ১১ই জুন, ১৯৭৪। মোকররম ফখরুদ্দীন ভাট্টি সাহেব ১৯১৮ সনে গুজরাতের একটি গ্রাম জালালপুর জাট্টাতে জন্ম গ্রহণ করেন। চার পাঁচ বছরের মাথায় তার মায়ের ইন্তেকাল হয়। মেট্রিক পরীক্ষা দেবার সময় পিতাও মারা যায়। তিনি প্রথমে সেনা ও পরবর্তীতে পুলিশে চাকরী করেন। পরে ব্যবসায় করেন, সর্বশেষে তিনি হাজারা জেলার একটি গ্রামে চাকুরী নেন এবং পরবর্তী জীবন একটু এবোটাবাদেই অতিবাহিত করেন। ১৯৭৪ সনে যখন আহমদী বিরোধী দাঙ্গা হয় তখন তিনি শুধু নিজ পরিবারেরই সাহস যোগাননি বরং ওখানকার সকল আহমদীদের সাহস দিতেন। ১১ই জুন, ১৯৭৪ সনে অবস্থার চরম অবনতি হয়। তিনি অফিসে গেলে তার বন্ধুরা তাকে ঘরে যেতে বাধ্য করে। সে দিন শহরে চরম উত্তেজনা ছিল এবং মিছিল মিটিং হচ্ছিল। তার ছেলের এক বন্ধু যে সেনাবাহিনীতে ছিল সে একটি ট্রাক পাঠিয়ে সংবাদ পাঠায় যে, আপনাদের মূল্যবান আসবাবপত্র সহ আমাদের এখানে চলে আসেন। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। স্ত্রী চাপ দিলে তিনি বলেন, যদি তুমি ঘাবড়িয়ে গিয়ে থাকো তবে সন্তানদের নিয়ে যেখানে ভালো মনে কর চলে যাও। আমি কোথাও যাবো না। অতঃপর তিনি হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব, যিনি কাবুলের শহীদ ছিলেন তাঁর (রাঃ) ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি বৃষ্টির মত পাথর নিক্ষেপের সময় হাসি মুখে প্রাণ দেন তথাপি শত্রুদের সামনে নতজানু হন নি।

তার কন্যা মুকররমা রুবিনা খলীল সাহেবা বর্ণনা করেন যে, বিকেল সাড়ে চারটার সময় একটি বড় মিছিল তাদের বাড়িতে আক্রমণ করে। গেট ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশের চেষ্টায় ঘরের দরজা ভাঙ্গতে শুরু করলে মরহুম শহীদ নিজে ও সন্তানদের নিয়ে দরজা ধরে রাখেন। যখন দরজা অর্ধেক ভেঙ্গে যায় তখন তিনি ফাঁকা গুলি চালান। যদ্ধরুন মিছিল ঘরের বাইরে অবস্থান নিয়ে চতুর্দিক হতে ঘরে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ঘরের দরজা জানালা ভেঙ্গে গেলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ উঠানের একটি গাছে চড়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে লাফ দেয়। এ কারণে মিছিলকারীরা অনেক চিল্লাচিল্লি করে। এক যুবক আক্রমণের জন্য ছাদে চড়লে মরহুম শহীদ তাকে গুলি করে এবং তার মরদেহ মিছিলের সামনে ফেলে দেয়। এরপর আর কেউ ছাদে উঠার সাহস করেনি। তবে প্রতিবেশীর বাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে এবং মরহুম শহীদ নিজের উঠানে একাই রয়ে যান।

শহীদের স্ত্রী ও সন্তানগণ প্রতিবেশীর এক গোসলখানায় আশ্রয় নেন, কিছুক্ষণ পর প্রতিবেশী নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের একটি জীপে করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। এবং এরপর মিছিলকারীদের বলে, ফখরুদ্দীনের স্ত্রী সন্তানগণ তার পরিবারের সাথে চলে গেছে। উত্তেজিত মিছিল তখন দ্বিতীয়বার ফখরুদ্দীন ভাট্টি সাহেবের বাসায় আক্রমণ চালায়। তখন যদিও মরহুম শহীদের কাছে পিস্তল ছিল কিন্তু গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে উত্তেজিত লোকজন তার উপর চড়াও হয়। তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তিনি দ্রুত সেখান হতে বেড়িয়ে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। তিনি যখন নেতিয়ে পড়লেন। তখন মিছিলকারীরা তাকে মারতে মারতে একটি মাঠে নিয়ে যায়। তিনি কলেমা শাহাদত পড়ছিলেন এ শুনে মিছিলকারীরা বললো, তুমি মৃত্যু ভয়ে এখন মুসলমান হচ্ছো আমরা তোমাকে ছাড়বো না। তিনি বললেন, আমি মৃত্যু হতে ভয় পাই না তোমাদের যা করার তা কর। আমি খোদার ফযলে মুসলমান। কাফের তো তোমরাই। কিছু লোক তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলে তাদের প্রতিও পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তিনি হাতের ইশারায় তাদের পিছনে চলে যেতে বলেন। অত্যাচারীগণ লাঠিসোটা ও চাকু দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকে এবং এভাবে এই নির্ভীক মুজাহিদ কলেমা পড়তে পড়তে শাহাদত বরণ করেন। তার উপর যখন পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল তিনি একবারও

নিজের চেহারাকে আঘাত হতে বাঁচার জন্য হাত দ্বারা মুখ ঢাকেন নি। শত্রুগণ আশ্চার্যান্বিত ছিল যে, এত আঘাতের পরও তিনি উফ্ পর্যন্ত করেন নি। পরে এরাই বলে বেড়াতো লক্ষ লোকের মাঝে এমন একজন (ভালো লোক) হয়ে থাকে। ঈমানদার নিষ্ঠাবান এবং অনেক গুণের অধিকারী ছিল। তার একটি মাত্র দোষ ছিল সে মির্যায়ী।

যালেমগণ পরিকল্পনা করলো যে, তাকে চৌরাস্তায় গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলাবে। তখন এক ঘোর বিরোধী ব্যক্তি বুদ্ধির সাথে কাজ করে তাদের একাজ হতে নিবৃত্ত করে। এর মধ্যে পুলিশ এসে শহীদের মরদেহকে খাটিয়াতে করে তুলে নিয়ে যায়। তার এক বিশ্বস্ত কুকুর তার লাশের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। এবং তিন দিন উপবাস থেকে কুকুরটিও মারা যায়। শহীদকে রাওয়ালপিণ্ডি এনে দাফন করা হয়। কুকুরটি নিজ মালিকের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে প্রাণ দিয়ে দিল কিন্তু মানুষ কতই হতভাগ্য যে, খোদার প্রতি বিশ্বস্ত হয় না।

বালাকোটের পুড়ী নিবাসী মোকাররম মোহাম্মদ যামান খান সাহেব ও মোকাররম মুবারক আহমদ খান সাহেব।

শাহাদতের তারিখ ১১ই জুন, ১৯৭৪। ফাগলা নিবাসী মুকাররম সৈয়্যদ বশীর আহমদ সাহেবের বর্ণনানুয়ায়ী আহমদীয়তের শত্রুগণ ১৯৭৪ সনের ১১ ই জুন তারিখে মুকাররম সৈয়্যদ বশীর আহমদ সাহেব ও তার পুত্র মুবারক আহমদ খান সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে। তাদের মরদেহের অবমাননা করা হয়। তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং একটি লাশকে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। মুকাররম মুহাম্মদ যামান খান সাহেবের তিন পুত্র মুনীর আহমদ খান সাহেব, মুনাওওয়ার খান সাহেব ও মাহমুদ আহমদ খান সাহেব এম.এ. জীবিত আছেন। মুকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেব চাকুরীজীবী, মুনীর আহমদ সাহেব ও মুনাওওয়ার আহমদ সাহেব সফল ঠিকাদার, কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মুকাররম বশীর আহমদ সাহেব (ফাগলা) ও মুকাররম নাযের সাহেব ইসলাহ ও ইরশাদ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছেন। মুকাররম মুহাম্মদ যামান খান সাহেবের স্ত্রী এখনও জীবিত আছেন, মাশাআল্লাহ তিনি বড়ই ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ ও সাহসী মহিলা।

ঝিলামের সেঠী মকবুল আহমদ সাহেব

শাহাদতের তারিখ ২রা জুলাই, ১৯৭৪ সন। তিনি ১৯৪২ সনে সেঠী মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদের পিতা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, নির্ভীক এবং উৎসাহী আহমদী ছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ঝিলামের আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম ছিলেন। শহীদের দাদা মিঞা মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব প্রাথমিক সাহাবীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) 'আনযামে আথম'-এ প্রকাশিত ৩১৩ জন সাহাবীদের মধ্যে তাঁর নাম ২০৫ নম্বরে লিপিবদ্ধ করেছেন। শহীদের দাদীও সাহাবীয়া ছিলেন। অনুরূপভাবে তার নানা মুকাররম শেখ ফরমান আলী সাহেবও সাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ দুই কূলেই তিনি ভালো বংশের ছিলেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ঝিলামে অর্জন করেন। অতঃপর তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, রাবওয়া হতে বি,এ পাশ করেন। অতঃপর ঝিলামে মকবুল সু ষ্টোর নামে ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৭২ সনে তার বিবাহ মরদানের এক আহমদী পরিবারে মুস্তাক আহমদ সাহেবের বোনের সাথে সম্পন্ন হয়।

শাহাদতের ঘটনা

১৯৭৪ সনের ২৯ই মে রাবওয়ার রেল ষ্টেশনের ঘটনার পর ঝিলাম শহরে উস্কানীমূলক কর্মকান্ড শুরু হয়ে যায়। মৌলভীরা প্রতিদিন মাইকে জামাত ও জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুরু করে। ১৯৭৪ সনে একটি দুষ্ট যুবক নিহত হলে মৌলভীরা জামাতের সদস্যদের উপর এ হত্যার অপবাদ দিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে আরো বেশী উস্কানী দিতে শুরু করে। মসজিদের স্পীকারে বার বার হত্যাযজ্ঞ ও লুটমার করার ঘোষণা দেয়া হয়। সেঠী আব্দুল হক সাহেব নামক একজন আহমদীকে হত্যার অভিযোগ গ্রেফতার করা হয়। এই সকল উস্কানীর কারণে চারটি আহমদী বাড়ী ও আট চল্লিশটি ব্যাবসায়ী কেন্দ্র লুটে নিবার পর ওগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। যখন চারটি আহমদী দোকানে আগুন লাগানো হয় তখন ঐ আগুন দ্বারা অন্যান্য দোকানেও আগুন লেগে যায়। সে সময়ে এস পি চৌধুরী মুহাম্মদ রমযান ঘোষণা দেয় যে, আর দোকানে আগুন দিবেন না এতে করে অন্যান্য মুসলমানদের দোকান আগুন লেগে যাচ্ছে, শুধু লুটমার করুন, একটি দোকানের তালা এস পি স্বয়ং নিজে গুলি করে ভাঙ্গে এবং দোকানে লুট করে। এ সময়ে সশস্ত্র মিছিল পুলিশের নিয়ন্ত্রণে সেঠী মকবুল আহমদ সাহেবের বাসায় আক্রমণ করে এবং এলোপাতারিভাবে গোলাগুলি করে সেঠী মকবুল আহমদ সাহেবের দুই ভাই ও দুই ভাবীকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তার এক ভাই সেঠী মাহবুব আহমদ সাহেবের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। মিছিলকারীরা দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। সেঠী মকবুল আহমদ সাহেব মিছিলের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

মৃত্যুর সময় শহীদ বিধবা স্ত্রী ও একপুত্র, যার বয়স দুই বছর ছিল, ছেড়ে যান। শাহাদতের দুইমাস পর মকবুল সানীর জন্ম হয়। সে আজকাল রাশিয়াতে মেডিকেলের শেষ বর্ষের ছাত্র। বড়পুত্র মমতাজ আহমদ সেঠী আষ্ট্রেলীয়াতে লেখাপড়া করছে। শাহাদতের পর শহীদের ভাই মাহবুব আহমদ সেঠী বিধবার সাথে বিয়ে করে বাচ্চাদের নিজের পরিচর্যায় নেন।

ঝিলামে এসব কিছুতে অগ্রগামী ছিল সেখানকার মজলিসে খতমে নবুওয়তের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মৌলভী হাফেয মুহাম্মদ আকরাম। সে ডায়বেটিকস এ আক্রান্ত হয় এবং তার শরীর পচতে শুরু করে। স্ত্রী সন্তান তাকে ছেড়ে চলে যায়। তার সেবার জন্য কেউ ছিল না। ইসলামাবাদের একটি বাড়ীতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তিন দিন পর (পচা গন্ধে) তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। দেহ হতে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। কেউ যখন তার মৃতুদেহ ঝিলামে পৌছায় তখন তার স্ত্রী, সন্তান ও শ্বশুর এ লাশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা বলে, এমন জঘন্য ব্যক্তির সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ঘর হতে কিছু দূরে মৌলভীরা তার নামাযে জানাযা পড়ে ও তার শবদেহ তার গ্রাম ফয়সালাবাদ জেলার সুমান্দরিতে পাঠিয়ে দেয়। ইহা ছাড়া মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের সভাপতিও ডায়াবেটিকসে আক্রান্ত হয়। তার দেহে ও ক্ষত হয় এবং তাতে পোকা হয় এবং এভাবেই তার মৃত্যু

হয়। মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবুওয়তের জেনারেল সেক্রেটারী নাসের ফিদা ১৯৭৪ সনের ২৩ শে মার্চ মসীহে মাওউদ দিবসের দিন নিজ সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ঝিলামের আহমদীয়া মসজিদে আক্রমণ করে। সে ঘৃণার সাথে মসজিদের গেট লাথি মেরে ভাঙ্গে। এসময়ে তার পায়ের নখে ক্ষত হয়। পরবর্তীতে উহা ক্যান্সারে পরিণত হয়। চিকিৎসার জন্য তার পা তিন বার কাটা হয়। শেষ পর্যন্ত এই রোগেই তার মৃত্যু হয়।

প্রফেসর আব্বাস বিন আব্দুল কাদের সাহেব

শাহাদতের তারিখ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪। তিনি ভাগলপুরের অধিবাসী ছিলেন। দেশ বিভক্তির সময় ১৯৪৭ সনে তিনি লাহোরে চলে আসেন। পরবর্তীতে সিন্ধুর হায়দ্রাবাদে চলে যান ও ওখানেই বসবাস করতে থাকেন। তার পিতা প্রফেসর আব্দুল কাদের সাহেব (রাঃ) হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী ছিলেন। হযরত আল্ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত সৈয়্যদা সারা বেগম সাহেবার বড় ভাই ছিলেন তিনি। শহীদ আব্বাস সাহেব শাহাদতের সময় হায়দ্রাবাদের গর্ভনমেন্ট কলেজে প্রফেসর ছিলেন। এর পূর্বে তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজেও প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন। তার বন্ধু বান্ধবের পরিধি ব্যাপক ছিল। সবাইকে জামাতের সাথে পরিচয় করানো নিজের দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তার শাহাদতের বাহ্যিক মূল কারণ ছিল তার ব্যাপকভাবে তবলীগ করা। সারা জীবন পুতঃ পবিত্র ও মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা

১৯৭৪ সনের ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার রাত দশটার সময় তিনি তার কোন বন্ধুর বাসা হতে ফিরছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি পিস্তল দ্বারা গুলি করে তাকে শহীদ করে দেয় (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। পূর্বের দিনটি ছিল শুক্রবার। সে দিন তিনি তার সকল চাঁদা আদায় করেছিলেন। এ বিষয়টি এর পূর্বে আপনাদের বুঝিয়েছি যে, আল্লাহ্ ভালো জানেন মৃত্যু কখন হবে। মনে হয় আল্লাহ্তালারই কোন ইঙ্গিত ছিল যে, আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হতে যাচ্ছো চাঁদা আদায় করে দাও। সুতরাং পরবর্তী দিনেই আল্লাহ্র ডাক চলে আসে।

তার স্ত্রী হুমদা বেগম আল্লাহ্র ফযলে জীবিত আছেন এবং নিজ দুই পুত্র হাম্মাদ ও আম্মার সহ বর্তমানে আমেরিকাতে বসবাস করছেন। এছাড়াও তার চার কন্যা আছে। বড় মেয়ে মরিয়ম শহীদ ডাঃ আকীল বিন আব্দুল কাদের সাহেবের পুত্র মুসলিমের স্ত্রী এবং নরওয়েতে আছেন। দ্বিতীয়া কন্যা বুসাইনা আমেরিকা নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার সরদার রফিক আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তৃতীয়া কন্যা বুশরা আব্বাস, যার বিবাহ মুকাররম নাসীর আহমদ সুলায়মানের সাথে হয়েছে এবং কানাডার টোরান্টোতে আছেন। চতুর্থ মেয়ে আমেরা আব্বাস ভাই আম্মারের সাথে জময ভূমিষ্ঠ হয়। আমেরার বিবাহ আমেরিকা নিবাসী ডাক্তার ফিরোজ পাডার সাহেবের সাথে হয়েছে। তিনি অধিকৃত কাশ্মীরের নাসেরাবাদের বাসিন্দা। তার জময ভাই আম্মারের বিবাহ শীঘ্রই হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ।

মাষ্টার জিয়াউদ্দীন আরশাদ সাহেব

শাহাদতের তারিখ ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭। তিনি ১৯১০ সনের ২০ শে অক্টোবর 'মিট রানঝাতে'জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫ বছর পর্যন্ত দারুল বরাকাত মহল্লার সদর ছিলেন। ১৯৭৪ সনের মে মাসে যখন হাঙ্গামা শুরু হয় তখন রাবওয়ার নিরপরাধ অনেককে পুলিশ ধোঁকা দিয়ে ধরে নিয়ে সারগোধা জেলে আটক করে এবং তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। এ সকল আটককৃতদের মাঝে মাষ্টার সাহেবের পুত্র ও ভাগ্নেও ছিলো। তিনি তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য ওফদের সাথে সারগোধায় যান। রাবওয়া আসার জন্য যখন তারা সারগোধা রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছান তখন সেখানে কয়েকজন নেকাব পরিহিত ব্যক্তি আহমদীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এর ফলে নয় জন গুরুতর আহত হন। মাষ্টার সাহেবও এ সকল আহতদের মধ্যে ছিলেন। তার মাথায় গুলি লেগেছিল। ফাইরিং এর পর যখন নেকাব পরিহিত দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যায় তখন আহমদীরা আহতদের গাড়ীতে করে নিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ বলে যতক্ষণ না রির্পোট লিপিবদ্ধ হয় ততক্ষণ আহতদের কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং আহতদের গাড়ী হতে নামিয়ে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করা হয়। যারা বেশী আহত ছিল তাদের সারগোধা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাষ্টার সাহেব তিন সপ্তাহ সারগোধা হাসপাতালে ছিলেন। অতঃপর তাকে লাহোরের জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তারগণ তার মাথা হতে গুলি বের করতে পারেন নি। কিছু সময়ের পর তাকে রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানে তিনি ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মরহুম মৃত্যুর সময় পাঁচ কন্যা ও ছয় পুত্র রেখে যান। তারা পাকিস্তান, সুইডেন ও কানাডাতেবসবাস করছে।

কুনরীর আব্দুল হামীদ সাহেব

শাহাদতের তারিখ ৩রা অক্টোবর, ১৯৭৪। জামাতে ইসলামীর পরিকল্পনানুযায়ী ৩রা অক্টোবর ,১৯৭৪ সনে এ খরব ছড়িয়ে দেয়া হয়ে যে, তিনি কুরআনে করীম জ্বালিয়েছেন। ৩রা অক্টোবরেই এ বিষয়ে জঙ্গী মিছিল বের করা হয়। এর অধিকাংশ ছিল ছাত্র এবং শহরের গুন্ডা বদমাশ। এ মিছিলের পিছনে জামাতে ইসলামী ও পুলিশের ইন্ধন ও নিরাপত্তা ছিল। তারা ডাঃ রশীদ সাহেবের ক্লিনিকে হামলা চালিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়, এর পর তার গরু মোষের গোয়ালে আগুন লাগিয়ে দেয়। মুহতরম আব্দুল হামীদ সাহেব গরু মোষগুলিকে বাঁচানোর জন্য দড়ি খুলতে গেলে মিছিলের মধ্য হতে কেউ গুলি চালায়। এতে করে তিনি সেখানেই শাহাদত বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) মরহুম শহীদ অবিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুর সময় মাতা- পিতা ও ভাই বোন রেখে যান। তার পিতা সরদার আহমদ সাহেব ১৯৮৭ সনে ইন্তেকাল করেছিলেন।

জেলা গুজরাতের থাল নিবাসী বাশারত আহমদ সাহেব।

শাহাদাতের তারিখ এই অক্টোবর ১৯৭৮। বাশারত আহমদ সাহেব পিতা গোলাম হুসেইন সাহেব ১লা নভেম্বর , ১৯৪৮ সনে গুজরাতের তেহাল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। মরহুমের চার ভাই ও এক বোন। তিনি ভাইদের মাঝে

সবচেয়ে ছোট ছিলেন। তিনি তেহাল গ্রাম হতে প্রাইমারী পাশ করেন ও সে সময়েই কুরআন নাযেরাও পড়ে নেন।১৯৬৬ সনে মেট্রিকও করার পর সেনাদলে যোগ দেন।

১৯৭৪ সনে যখন সারা দেশে আহমদী বিরোধী আন্দোলন চলছিল তখন তেহালগ্রামও এর অগ্নিশিখা হতে বাঁচেনি। চতুর্দিকের ছয়টি গ্রাম মিলে তেহালের উপর আক্রমণ চালায়। আহমদীদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আসবাব প্রত্র লুটে নেয়া হয়, চতুস্পদ প্রাণীও লুটে নিয়ে যায়। এ রূপ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে এস, পি, চিমা সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এ নৃশংস ঘটনায় শরীক লোকদের বাধা দেন আর এ কাজ করতে গিয়ে আক্রমণকারীদের দু' জন মারাও যায়। সাময়িকভাবে বিরোধিতা দমে গেলেও ভিতরে ভিতরে তুষের আগুন জ্বলছিল।

রমযান মাসে এক বিকেলে চারটার সময় শহীদের দুই অল্প বয়স্ক ভাতিজা তানভীর আহমদ ও বশীর আহমদ কাঁদতে কাঁদতে ঘরে প্রবেশ করে, তারা বললো, রাস্তায় কয়েকজন গয়ের আহমদী ছেলে আমাদের মির্যাই মির্যাই বলে তিরস্কার করে আমাদের পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। আমরা কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ঘরে এসেছি। মুকাররম বাশারত আমহদ সাহেব ইহা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন, আমি তাদের বড়দের গিয়ে বলি, একি ভদ্রতা? আমাদের বাচ্চারা রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে না। তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে বুঝাও। সবাই বাধা দিল, তুমি যেওনা অবস্থা ভালো নয়। তিনি তাদের কথা শুনেননি। বললেন, আমিতো মারামারি করতে যাচ্ছি না। তাদের বুঝাতে যাচ্ছি। কিছু হবে না । আমরা কেন লেজ গুটিয়ে থাকবো। কবরে যা অন্ধকার আছে তা বের হয়ে বাইরে আসে না সুতরাং তিনি সে সকল ছেলেদের পিতা-মাতার কাছে যান এবং বলেন, দেখুন এরূপ করা উচিত নয়। ইহা ভালো কাজ নয়, ছেলেদের মা বলে উঠে তুমি কাফির, আমাদের ঘর হতে বেরিয়ে পড়, তুমি আমাদের উঠান অপবিত্র করে দিয়েছো। তিনি ঘর হতে বের হতেই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র ব্যক্তিরা বেরিয়ে আসে এবং সাথে সাথে লাঠি দ্বারা তাকে আঘাত করতে শুরু কবে। একটি আঘাতে তার মাথার হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নাড়ী চলছিল, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অল্প সময় পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তিনি বিধবা ও এক মেয়ে রেখে যান। মেয়েটির বিবাহ হয়ে গেছে।

দুষ্কর্মের ফল ঃ- যে পরিবার বাশারাত আহমদ সাহেবকে শহীদ করেছে তাদের এক ছেলে রেল হতে পড়ে মারা যায়। তার দেহ কয়েক টুকরা হয়ে যায়। দ্বিতীয় ছেলেটি নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, এবং এভাবে গোটা পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ যে মহিলার ষড়যন্ত্র ছিল তার সন্তানদের এই পরিণাম হয়।

চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেব শহীদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব শহীদ

শাহাদতের তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬। চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেব ১৯১০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম চৌধুরী শাহনওয়াজ সাহেব এবং মাতার নাম হাকেম বিবি সাহেবা। মরহুম শহীদ জন্মগত আহমদী ছিলেন। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বছর ছিল। তার গ্রাম তালওয়ানডি ছুনগলা কাদিয়ান হতে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ১৯৪৭ সনে হিজরত করে সিয়ালকোট জেলার ডাসকা তহসীলের খুরুলিয়া গ্রামে চলে আসেন। চার বছর পর ফয়সালাবাদে শ্বশুরালয়ে কয়েক বছর থাকেন। অতঃপর মূসাওয়ালা চলে যান, কেননা, তার জমীনের এলটমেন্ট মূসাওয়ালাতে হয়েছিল।

শাহাদতের ঘটনাঃ- আহমদীয়া মসজিদ যা ১৯৭৪ সনের পূবেই তৈরীকৃত ছিল তাতে আহমদী ও অআহমদী দুই দলই নামায পড়তো। পরবর্তীতে আরো একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। যা অআহমদীগণ গ্রামে অবস্থিত নিজেদের জমীনে নির্মাণ করে। দুই দলই এই মসজিদ নির্মাণে অর্থ খরচ করে, আর এভাবে আহমদী ও আহমদীগণ পৃথক পৃথক নামায পড়তে শুরু করে। গ্রামের কতিপয় দুষ্ট লোক ও ডাসকা হতে মৌলভী এসে উস্কানী দিতে শুরু করে। গোপনে তারা ফিত্না-ফাসাদের ষড়যন্ত্র করে। মসজিদের চতুর্দিকে একই বংশের লোকদের অবস্থানের কারণে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায় নি। এভাবে ৩০শে রমযানের রাত আসে। সিদ্ধান্তানুযায়ী (আহমদীগণ ঈদের) নামায ঐ ঈদগাহে আদায় করার কথা যেখানে অআহমদীগণও ঈদের নামায পড়ে। ফজরের নামাযের পর চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেব নিজ দুই পুত্রকে বললেন , (নামাযের জন্য) সফ নিয়ে ঈদগাহে যাও এবং নিজেও যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, দুষ্কৃতিকারীরা ষড়যন্ত্রঅনুযায়ী ছেলেদের উপর আক্রমণ করে। চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেব এবং তার ভাই মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব যখন ঈদগাহে প্রবেশ করলেন তখন কয়েক ব্যক্তি কুড়াল ও লাঠি দ্বারা তাদের আঘাত করতে শুরু করে। দুজনেই খালি হাতে ছিলেন চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেব আহত হবার এক ঘন্টা পর শহীদ হন এবং কয়েক ঘন্টা পর চৌধুরী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবও ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেব মূসাওয়ালা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সৌভাগ্যবান প্রথম শহীদ তার বিধবা স্ত্রী আমানত বিবি সাহেবা মূসাওয়ালাতে এখনও জীবিত আছেন। শাহাদতের সময় তিনি পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। মুকাররম আব্দুস সাত্তার সাহেব কৃষিজীবী। মুকাররম ফরযন্দ আলী সাহেব অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য এবং মুসাওয়ালাতেই থাকেন। মুকাররম আসগর আলী সাহেবও অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য এবং রাবওয়ার তাহেরাবাদে আছেন। মুকাররম মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব বিমান বাহিনী হতে অবসর প্রাপ্ত এবং বর্তমানে লাহোরে আছেন। মুকাররম আরশাদ আলী সাহেব জার্মানীতে আছেন। মেয়েদের মধ্যে রাযিয়া সাহেবা লাইয়া ও দ্বিতীয় কন্যা সাফিয়া সাহেবার বিবাহ ফয়সালাবাদে হয়েছে। চৌধুরী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রী আয়েশা বিবি সাহেবা জীবিত আছেন। তিনি মুসিয়া। তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তিন পুত্র আকবর আলী সাহেব, নাসের আহমদ সাহেব ও মাহমুদ আমদ সাহেব সিয়ালকোট জেলার 'ভারোকে খুরদ' গ্রামের জমীদার। মেয়েদের মধ্যে মুহতারেমা শরীফা বিবি সাহেবা জেলা বাহাওয়াল নগরের হারুন আবাদ এবং সকিনা বিবি সাহেবা ও আযীফা বিবি সাহেবা দু'জনেরই লালুমূসাতে বিবাহ হয়েছে।

খোদাতাআলার ফযলে সবাই ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে আছেন।

রাশীদা বেগম সাহেবা

শাহাদতের তারিখ ৯ই আগষ্ট, ১৯৮৭। রাশীদা বেগম সাহেবার স্বামী ক্বারী আশেক হুসেন সাহেবের বর্ণণানুযায়ী তাঁর স্ত্রী সাংলা হিলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা শেখপুরা জেলার মরিয়ম আবাদের নিকট ' 'চাঁদর চক' এর জমীনদার ছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর পরিবার ছিল। তিনি জাগতিক জ্ঞানার্জন করেন নি, কুরআন খুব ভালো জানতেন, এবং অনেক বাচ্চাদের কুরআন পড়িয়েছেন।

আহমদীয়ত গ্রহণ ঃ আল্লাহ্তাআলার তরফ হতে প্রাপ্ত সুসংবাদানুযায়ী ১৯৭৬ সনে ক্বারী সাহেব যখন আহমদীয়ত কবুল করলেন তখন তিনি তার স্ত্রী রাশীদা বেগমকে বললেন, আমি তো আল্লাহ্তাআলার দেয়া সুসংবাদানুযায়ী আহমদী হয়ে গেছি। আপনিও যদি আহমদী হয়ে যান তবে খুব ভালো হয়, নতুবা ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। এ কথাতে তিনি নীরব থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, এখন নয় পরে বলবো। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে যায়।

একদিন তার পিতা, চাচা এবং অন্য কিছু লোক তার নিকট আসে এবং চাপ দিয়ে বলতে থাকে হাফেয তো কাফির হয়ে গেছে তুমি বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের সাথে চলো, এতে রাশীদা বেগম বললেন, যদি হাফেয সাহেব কাফির হয়ে থাকে তবে আমিও তার সাথে কাফির বলে মনে করুন। যদি তিনি দোযখে যান আমিও দোযখে যাবো। সুতরাং তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। ১৯৭৬ সনের সালানা জলসার তিনি রাবওয়াতে আসেন। তিনি আহমদী মহিলাদের অসাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দেখে বলে উঠেন যে, ইহা খোদার কাজ নতুবা মহিলাদের এরূপ তরবীয়ত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ঐ বছরই বাড়ী ফিরে গিয়ে বয়াত হন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তার বয়াতের অঙ্গীকারকে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ করেছেন। এবং এ পথে সকল ধরনের দুঃখ ও ত্যাগকে হাস্য বদনে গ্রহণ করেছেন। প্রতিদিন অআহমদীগণ দল বেঁধে বাসায় আসতো ও তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হতো। তারা তাকে মানসিকভাবে কষ্ট দিত। কিন্তু তাদের কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও তিনি তাদের ভালোবাসার সাথে আপ্যায়ন করতেন। মরহুমা আহমদীয়ত গ্রহণের পূর্ব হতেই নামায, রোযা ও তাহাজ্জুদের পাবন্দ ছিলেন। আহমদীয়ত গ্রহণের পর তার এই গুণাবলী আরো পূর্ণ রূপে বিকশিত হয়, নামায রোযা তাহাজ্জুদ পালনের সাথে সাথে নফলও বেশী বেশী আদায় করতেন। অনেক সত্য- স্বপ্ন দেখতেন, গরীবদের অনেকভাবে সাহায্য করতেন। জামাতের সদস্যদের খুবই সম্মান করতেন। জামাতের প্রোগ্রাম ও অঙ্গ সংগঠনের সাথে সহায়তা করার প্রতি আকর্ষণ ছিল। চাঁদা রীতিমত আদায় করতেন। খোদা-প্রদত্ত গুণাবলীর কারণে মেয়েদের মাঝে ব্যাপক তবলীগ করতেন।

১৯৭৮ সনের ৮ই আগষ্ট রমযানের তিন তারিখ ছিল। ক্বারী সাহেব তারাবীর নামায পড়িয়ে এসে দেখেন যে, বৈঠক খানায় দু'জন মেহমান বসে আছে, তারা পুরাতন বন্ধু ছিলেন, তিনি তাদেরকে বিদায় করে এসে দেখেন যে, তিনি (স্ত্রী) তখনও ঘুমান নি। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এখন ঘুমাননি কেন? তিনি বললেন, হাফেযজী আমার ঘুম আসছে না, হাফেয সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন গতকাল রাতে আল্লাহ্তাআলা আমাকে জানিয়েছেন যে, যে ছেলেটিকে তুমি পেলেছো সে তোমার হত্যাকারী। এ ছেলেটি ক্বারী সাহেবের ভাতিজা তার নাম আব্দুল্লাহ্। নয় মাস বয়স হতে বিশ বছর (হত্যা করার সময় পর্যন্ত) পর্যন্ত মরহুমা তাকে লালন পালন করেছেন। তার সত্য স্বপ্নটি দেখুন কত মহান এবং কীভাবে তা পূর্ণ হয়। ইহা যে পূর্ণ হবে তা তিনি বিশ্বাস করছিলেন। ছেলেটির অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। বিরোধীরা ছেলেটিকে তার পালক মা'র বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করে। তিনি (ক্বারী সাহেবকে) বললেন, আমার মতে এখানে আমাদের থাকা সঠিক হবে না। সাংলা হিল ছেড়ে আমাদের রাবওয়া চলে যাওয়া উচিত। পাছে এ ছেলের দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি না হয়ে যায়। হাফেয সাহেব বললেন, সদকা দাও, অসুবিধা হবে না। আল্লাহ্তাআলা ফযল করবেন। সে তো তোমার ছেলে, সে এরূপ করবে না। কিন্তু খোদার কথা তো অবশ্যই পূর্ণ হবার ছিল। সকাল বেলায় সাংলাহিলের আমীর সাহেব ক্বারী সাহেব ও অন্য আরো দু'একজন সহ ফয়সালাবাদে এক মৃতের বাড়ীতে সহানুভূতি প্রকাশ করতে যান। আব্দুল্লাহ্ যে এক বছর পূর্বে শেখপুরা চলে গিয়েছিল সে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে প্রবেশ করতেই (মরহুমার) এক মেয়ে যে প্রাইমারী স্কুলে পড়তো তার উপর চাকু দ্বারা হামলা করে। আক্রমণ সুবিধা মত করতে না পেরে সে অন্যান্য সন্তানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য অগ্রসর হলে তিনি ছেলের হাতে পর্যুদস্ত হন। যালেম ছেলেটি তার বুকে চেপে বসে এবং চাকু দ্বারা আঘাত করতে থাকে। তিনি নিরুপায় ছিলেন। বাধা দেবার চেষ্টা করছিলেন এবং বলছিলেন, আব্দুল্লাহ্, কোন কারণে তুমি আমাকে মারছো তা তো বলো। সে বললো, তুমি কাফির হয়ে গেছো তাই তোমাকে মারছি। যাই হোক যখন সে মনে করলো তিনি মারা গেছেন সে তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য বাচ্চাদের দিকে দৌড়ায় কিন্তু তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সিভিল হাসপাতাল নিকটেই ছিল, লোকেরা তাকে ও আহত মেয়েকে সেখানে পৌঁছে দেয়। এ ঘটনার আধা ঘন্টা পর ক্বারী সাহেব ফয়সালাবাদ হতে সেখানে পৌঁছান। সাংলাহিলের আমীর সাহেবের নির্দেশে আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে ফয়সালাবাদের সিভিল হাসপাতালে পৌছানো হয়। সেখানে ডাক্তার ওলী মোহাম্মদ সাহেব নিষ্ঠার সাথে অপারেশন করেন। (ফাযাযাহুল্লাহু আহসানুল জাযা)। ডাক্তার সাহেব তিন ঘন্টা পর অপারেশন রুম হতে বের হন এবং বের হতেই কেঁদে পড়েন এবং বলেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলায়হে রাজেউন) রাশীদা বেগম মারা গেছেন। মেয়েটির আশা আছে সে ইনশাআল্লাহ বেঁচে যাবে।

মরহুমার তিন ছেলে ও তিন মেয়ে, বড় ছেলে আরেফুল্লাহ্ সাহেব আরবীতে এম, এ, পাশ। রাবওয়াতে ব্যবসা করছেন, বাকী দুই ছেলে কানাডাতে আছে। তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। মুকাররম মালেক মুহাম্মদ আনওয়ার সাহেব পিতা মালেক মুহাম্মদ শফী সাহেব। শাহাদতের তারিখ ২২শে আগষ্ট, ১৯৮৭। সময় হয়ে গেছে। আমার যুগের শাহাদতের বর্ণনা শুরু করবার পূর্বেই এই শাহাদতের বর্ণনা দিব।

অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আমহদ সদর, মুরব্বী।

মিনহাজুত্তালেবীন

(শিক্ষার্থীদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(চতুর্থ কিস্তি)

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক কথাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। আর জামাতের ঐক্যের জন্যে ইহা আবশ্যকীয় যে, যদি কারও কোন কথায় মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহলে উহাকে যেন খলীফার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি এভাবে না করে আর মতভেদকে স্বীয় অন্তরে পোষণ করে সাধারণ লোকের মধ্যে ইহা ছড়িয়ে দেয় তাহলে সে বিদ্রোহের কাজ করে। তার নিজের সংশোধন করা প্রয়োজন।

এর পরে আমি আর একটি উপদেশ দিতে চাই আর তা হলো এই যে, হুক্কা খাওয়া খুব খারাপ কাজ। আমাদের জামাতের লোকদের ইহা পরিত্যাগ করা উচিত। কতক লোক আমাকে বলেছেন যে, আমরা এমন ইলহাম (ঐশীবাণী) লাভকারী দেখেছি, যে হুক্কা সেবন করছিলো আর তার নিকট ইলহাম হচ্ছিলো। এ প্রসঙ্গে আমার একটি মজার কাহিনীর কথা মনে পড়লো যা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলতেন। কতক বণিক বসে ইহা বলতেছিলো যে, যদি কেউ ১ পোয়া তিল খায় তাহলে তাকে ৫ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। পাশ দিয়ে একজন কৃষক যাচ্ছিলো। সে ইহা শুনে পাঞ্জাবী ভাষায় বল্লো– সাল্লিয়া সমেত কে এইঁ অর্থাৎ ঐ ডালপালা সহ তিল খেতে হবে যার মধ্যে ইহা জন্মে, না উহা ব্যতিরেকে? কেননা, সে মনে করলো যে, একপোয়া তিল যাওয়া এমন আর কী বড় কথা যাতে পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে ? বণিকরা বল্লো, ভাই তুমি চলে যাও, আমরা তোমার সাথে কথা বলছি না। তাই স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য হতে পারে। এক ব্যক্তির নিকট যা বড় হয় অন্য ব্যক্তি তা সাধারণ মনে করে। যদি আমরা ইহা স্বীকার করেও নিই যে, হুক্কা সেবনকারীর নিকট খোদার ইলহাম হয়ে থাকে তাহলেও বলতে হবে যে, ঐ ইলহাম উত্তম মার্গের হবে না। কেননা, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ পর্যন্ত বলেন যে, রসুন খেয়ে মসজিদে আসবে না। উহার দুর্গন্ধের কারণে ফিরিশ্‌তা আসে না। আবার রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সামনে কাঁচা রসুন রাখা হয়েছিলো কিন্তু তিনি খান নি। সাহাবায়ে কেরাম বল্লেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরাও খাব না। তিনি (সঃ) বল্লেন, তোমাদের সাথে খোদা কথা বলেন না, তোমরা খেতে পারো। এ ধরনের হাদীস সত্ত্বেও কি করে ইহা মেনে নেওয়া যায় যে, হুক্কা সেবনকারীর নিকট ফিরিশ্‌তা আগমন করে যখন কিনা হুক্কার দুর্গন্ধ রসূন থেকেও অধিক খারাপ হয়ে থাকে। আর হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হুক্কা থেকে কম দুর্গন্ধপূর্ণ জিনিষের ব্যাপারে বলেছেন যে, উহাকে আমি ব্যবহার করি না। কেননা, আমার নিকট ফিরিশ্‌তা আসে। অতএব যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেন সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ইলহামের দাবীদার বা যার ইলহাম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে তারও হুক্কা সেবন থেকে বিরত থাকা দরকার। আর আমি তার চেহারা দেখতে চাই, যে ইহা বলে যে, আমার ইলহাম লাভের আকাঙ্ক্ষা নেই। যদি এমন কোন ব্যক্তি না থাকে তাহলে কারও হুক্কা সেবন করা উচিত নয়।

পুনরায় আমি বলছি যে, হতে পারে যে, এমন ব্যক্তির নিকট যদি ইলহাম হয়েও যদি যায় তাহলে উচ্চ মার্গের ইলহাম হবে না। আর আমরা বলবো, যদি সে হুক্কা সেবন না করতো তাহলে তার তাথেকে উচ্চ মার্গের ইলহাম লাভ হতো যা হুক্কা সেবনের অভ্যেস থাকার পরও তার লাভ হয়েছে। তার নিকট হয়ত সাধারণ ফিরিশ্‌তা এসে থাকবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম লিখেছেন, কতক নটির নিকটও ইলহাম হয়ে যায়। তার নিকট ফিরিশ্‌তা যায় কি যায় না, এ রকম ফিরিশ্‌তা হয়ত হুক্কা সেবনকারীর নিকট গিয়ে থাকবে। যদি কোন হুক্কা সেবনকারীর নিকট ইলহাম হয় তাহলে আমি বলি, ইহা তার জন্যে আনন্দের কথা নয়। যদি সে হুক্কা সেবন করা ছেড়ে দিতো তাহলে তার নিকট উচ্চ মার্গের ফিরিশ্‌তা আগমন করতো।

এর পরে আমি এক বন্ধুর মান-সম্মানের উল্লেখ করতে চাই। বিগত মজলিসে শূরাতে একটি প্রশ উত্থাপন করা হয়েছিলো যা নূর পত্রিকার সম্পাদক সম্পর্কিত ছিলো। ধারণা করা হয়েছিলো যে, তার ইঙ্গিতে ঐ কথা প্রশ্নকারী উঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমি "যদি" এর শর্ত লাগিয়ে বলেছিলাম যে,যদি তিনি এরূপ করে থাকেন তাহলে ভুল করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল যে, তিনি এরূপ করেন নি। এজন্যে যখন রিপোর্ট প্রচারিত হয়েছিলো তখন উহা থেকে ঐ অংশ কেটে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ফারুক পত্রিকার সম্পাদক ঐ ঘটনাকে প্রচার করে দেন। আমার বেশী দুঃখ লেগেছে ঐ কথায় যে, ফারুকের ব্যাপারে ঐ কথা-বার্তা হয়েছিলো। অথচ ফারুকের পক্ষ থেকে আমিই তো প্রতিশোধ নিয়েছিলাম ; কিন্তু ফারুক ইহাকে যথেষ্ট মনে করে নি। আমি তখন ফারুকের যথাসম্ভব সহায়তা করেছিলাম কিন্তু ফারুক-এর সম্পাদক এর ওপরে ধৈর্য ধারণ করেন নি এবং নিজের এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন যেহেতু এ বিষয়ে পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে। তাই এর খন্ডনও সম্মেলনে করছি। ইহা যদি কারও খারাপ লাগে তাহলে সে নিজের ওপরে ধিক্কার দিক যে তার সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। *

এখন আমি জামাতের আর্থিক অবস্থার ওপরে কিছু বলতে চাই। আমাদের জামাতের আর্থিক অবস্থা এই দিনগুলোতে নেহায়েৎ দুর্বল। আমাদের বন্ধুগণ যতদূর সম্ভবপর হয় সাহায্য করেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের প্রয়োজন পূণ হয় না। আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়। এসব আমাদের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হয়ও যদি তাহলে এর মধ্যে আমরা এতটুকুই অংশীদার যতটুকু আপনারা অংশীদার। কেননা, এসবের অর্থ জামাতের জন্য প্রয়োজন। এখন কষ্টের যে অবস্থা উহাকে অধিক দীর্ঘ হতে দেয়া যেতে পারে না। কেননা, উহাতে ফেৎনা সৃষ্টি হয়। এখনও এই অবস্থা রয়েছে যে, কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন এখনও পাওয়া আর তাদের মধ্যে ২৫-৩০ জনের অবস্থা সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, তারা কয়েক বেলা ধরে অনাহারে আছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একজন পুরনো সাহাবী আমার নিকট এসে কেঁদে ফেলেন যে, এতদিন ধরে উপোস করছেন। আর কাজ করতে গিয়ে বেহুস হওয়ার পর্যায়ে গিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় আমার মন চায় যে, ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে কোথাও জঙ্গলে গিয়ে বসি। কিন্তু ঐ ধারণা থেকে বিরত থাকলাম

* ফারুক-এর সম্পাদক মু'মিন হিসেবে ঐ সময় এ ভুলের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এজন্যে তার ওপরেও কোন অভিযোগ নেই।

যে, আত্ম হত্যার শামিল না হয়। এখন মানুষ বুঝতে পারে যে, এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে দীর্ঘ সময় ধরে মুলতবী রাখা যেতে পারে না। নিঃসন্দেহে বাইরের জামাতের বন্ধুগণকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, তারা এমন কোন ধনী ও বড়লোক নয়। কিন্তু আমি বলি যে, তাদেরও কি এমনই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় যেমন কিনা এখানে আমাদের করতে হয় ? একদিন তো এসব কষ্টের কারণে আমার এরকম মনে হলো যে, আমার ইচ্ছা শক্তি একেবারে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আর আমি যেন আমার দেহের আচ্ছাদন ছিন্ন-ভিন্ন করতে যাচ্ছিলাম। নিঃসন্দেহে আমাদের জামাতের ওপরে ভারী বোঝা অর্পিত। এবং তারা অনেক কিছু খোদার পথে ব্যয় করেন। কিন্তু জামাতকেই গোটা বোঝা উঠাতে হবে। অন্যদের কাছ থেকে তো আমরা কিছু নিতে পারি না। আমি এখনই বলেছি যে, আমাদের জামাত অনেক দায়িত্ব পালন করেছে ; কিন্তু জামাতের সামগ্রিক অবস্থা অবলোকন করে আমি বলতে পারি যে, আমাদের জামাত এখনও এতটা আর্থিক কুরবানী করে নি যতটা কুরবানী প্রাথমিক জামাতগুলো করতো। আমি রোমে ঐ স্থান প্রত্যক্ষ করেছি যেখানে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মান্যকারীগণ শত্রুদের কঠোরতা ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অবস্থান করছিলেন। ঐ স্থানটি প্রায় ২০ মাইলের মত দীর্ঘ ছিলো। খৃষ্টানগণ তাদের ঘর-বাড়ী ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। আর তারা উপোসের পর উপোস করে চলছিলেন। সূরাতুল কাহ্ফে তাদের নাম 'আসহাবে কাহফ' বা গুহাবাসী এবং আর রকীম (ফলক খোদাইকারী) রাখা হয়েছে। আমি কয়েক ঘন্টার জন্যে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু কতক বন্ধু সেখানে অবস্থান করা বরদাশ্ত করতে পারছিলেন না। যদিও ঐসব লোক বহু বছর ধরে দাকিয়ানূসের সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করছিলেন। উহা ছিলো এমন গুহা যা নেহায়েৎ কষ্টদায়ক ও অন্ধকার কর্দমাক্ত। সরকারী সৈন্যরা সেখানে যাদেরকে মেরে ফেলেছিলো তাদের কবরগুলোও সেখানে নির্মিত হয়েছিলো এবং ওগুলোর ওপরে স্মৃতিফলক লেখা আছে এই বলে যে, অমুককে অমুক সময়ে হত্যা করা হয়েছে। এরা ছিলো ঐসব লোক যারা খোদার জন্যে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এখন এমন কষ্ট সহ্য করেছিলেন যার কথা স্মরণ হলে এখনও দেহের লোম শিউরে ওঠে। আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম হযরত মসীহ্ নাসেরী (আঃ) থেকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আবার আপনাদের একথাও মনে রাখা উচিত যে, আমাদের কুরবানীও হযরত মসীহ (আঃ)-এর মান্যকারীগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্ত বর্তমানে আমাদের কুরবানী কি এমনই ? যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন যে, **ব্যক্তি ওসীয়্যত করে না সে মুনাফিক (কপট) আর ওসীয়্যতের হার হলো কমপক্ষে সম্পদের এক দশমাংশ যার মধ্যে সাধারণ চাঁদা যা সময়ে সময়ে দেয়া হয় তা অন্তর্ভুক্ত নয়।** কিন্তু আমাদের জামাত এখন নিজেদের আয়ের ১৬ ভাগের এক অংশ চান্দা দিয়ে থাকে আর কতক ইহাও দেয় না বরং উহা থেকে কম হারে দিয়ে থাকে। আর কতক মোটেও দেয় না। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে যে, আমাদের ওপরে বিরাট বোঝা পড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যে কাজ করার জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা অতি বিরাট। এখন যেসব লোক বলে যে, আমাদের ওপরে বিরাট বোঝা পড়ে গেছে তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে হাতী উঠাতে গিয়েছিলো। আর যখন উঠাতে ছিলো তখন বল্লো, এ তো খুব ভারী বোঝা। অথবা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে হাতে অঙ্গার রাখতে চাচ্ছিলো এবং পরে বলো, এতে তো হাত জ্বলে যাচ্ছে। অতএব যে জাতি ইহা বলে যে, তারা দুনিয়াকে এমনভাবে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে যেভাবে ডিনামাইট পাহাড়কে উড়িয়ে দেয় তাদের জন্যে ইহা আবশ্যকীয় যে, তারা ডিনামাইটের ন্যায় ফেটে গিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করে দেয়। কখনও কি বারুদ তার অস্তিত্বকে বজায় রেখে কোন বস্তুকে উড়িয়ে দিতে পারে ? অথবা ডিনামাইট নিজের ধ্বংস ব্যতিরেকে কি কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে ? যদি না পারে, আর অবশ্যই পারে না তাহলে তোমাদেরও এরূপই করতে হবে। যদি তোমরা স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব বিজয় করতে চাও তাহলে ডিনামাইটে রূপান্তরিত হয়েই তা করতে পারো। কেননা, ক্ষুদ্র ডিনামাইটই এ রকমই যা বড় অঞ্চলকে ওলট-পালট করে দেয়। আর এর অর্থ এই যে, আমরা দুনিয়াকে উড়িয়ে দেবার আগে নিজেরা উড়ে যাবো। তোমাদের মধ্যে কি এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ মার্গ পর্যন্ত তোমরা কি পৌঁছে গেছ ? যদি না হয়ে থাকো তাহলে সমগ্র বিশ্ব বিজয় করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কীভাবে বলতে পারো যে, তোমাদের ওপরে অনেক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের অবস্থার প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যে, সে ঐ অঙ্গীকারকৃত ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্যে কী পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা করেছে। ইহা প্রত্যেক আহমদীর প্রাথমিক কর্তব্য। আর এজন্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি এ বিষয়ে দৃষ্টিপটে রেখে তোমরা এ দায়িত্বকে অবলোকন করো যা তোমার ঐ সময় পর্যন্ত পালন করেছো তাহলে তোমরা অবহিত হতে পারবে যে, উহা তো নগণ্যই মাত্র। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

শুভ বিবাহ

গত ০৭/০২/২০০০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার মোসাম্মৎ নাছরিন সুলতানা (সুমী) পিতা- মোঃ আব্দুল কুদ্দুস জয়দেবপুর, গাজীপুর, ঢাকা-এর সহিত জনাব মোঃ আল আমিন পিতা- শামসুল হক, গ্রাম- তারুয়া পোঃ- থানা, জিলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিবাহ ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিবাহের এলান ও দোয়া করান সদর মুরব্বী মৌলানা আব্দুল আওয়াল খাঁন চৌধুরী। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা হইতেছে।

❑ গত ০১/০১/২০০০ইং রোজ শনিবার মোসাম্মৎ মোহসেনা বেগম পিতা- জনাব ইসরাইল দেওয়ান, গ্রাম- শালশিরি, পোঃ ফুলতলা জেলা- পঞ্চগর-এর বিবাহ জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন মাকসুদ হিম, পিতা- মরহুম এস. এম. আব্দুর রউফ, গ্রাম- রামগোপালপুর পোঃ রিকাবী বাজার, জেলা- মুন্সীগঞ্জ এর সহিত টাকা ১০০০০১/- (এক লক্ষ এক) দেন মোহরে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য জামাতের সকল বন্দুগণের নিকট দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

❑ গত ০৩/০২/২০০০ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার মোসাম্মৎ রহিমা বেগম, পিতা- হাফেজ মীর মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ৮৮৮, পলাশপুর দনিয়া, ঢাকা-এর সহিত জনাব ফারুক উদ্দিন ভূইয়া পোঃ- গ্রামঃ বিষ্ণুপুর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিবাহ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিবাহের এলান করেন মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী দোয়াও পরিচালনা করেন। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

আব্দুল কাদির ভুইয়া
সেক্রেটারী রিশতানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

সালানা জলসা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৭৬তম সালানা জলসার সাফল্যজনক সমাপ্তি

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযল ও করমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৬তম সালানা জলসা নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও অভূতপূর্ব সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ৩ দিনব্যাপী এ জলসা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জুমুআর নামাযের পরে শুরু হয়ে ৫টি অধিবেশনে ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখ সন্ধ্যায় সমাপ্ত হয়। এতে সর্বমোট ৩৫১৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন; তন্মধ্যে নও মুবাঈন হলেন ১২০ জন এবং জেরে তবলীগ অআহমদী মেহমান ৪৬০ জন। লাজনার সদস্যদেরও প্রতিনিধিত্বমুলক যোগদানের ব্যবস্থা ছিলো। জলসার সময়ে ১৮৪ জন বয়াত হয়ে আহমদীয়া সেলসেলায় দাখিল হন।

উদ্বোধনী অধিবেশন ঃ

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াত করেন আল্‌হাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব কাযী আব্দুশ শাকুর। হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন। আগত মেহমানদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মীর মোবাশ্বের আলী। মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর উদ্বোধনী ভাষণের পরে বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। 'আল্লাহ্‌তাআলা ও তাঁর পবিত্র কালাম' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান। জনাব ইব্রায়েতুল হাসান-এর বাংলা নযম পাঠের পর অধিবেশনের শেষ বক্তৃতা হয় 'ইসলামী খেলাফত ও তার কল্যাণ' বিষয়ের উপর। বক্তব্য রাখেন মোহতরম মাওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব, হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। তাঁর বক্তৃতার যুগপৎ বঙ্গানুবাদ করেন মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী।

৭৬তম বার্ষিক ন্যাশনাল সালানা জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

উদ্বোধনী অধিবেশনে নযম পেশ করছেন ইব্রায়েতুল হাসান

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আব্দুর রহীম। জনাব সুলতান আহমদের নযম পাঠের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়।

'আহমদী মহিলাদের দায়িত্ব' বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব। তাঁর বক্তব্যের যুগপৎ বঙ্গানুবাদ করেন মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী। মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী বক্তব্য রাখেন 'ঐশী জামাতে মুখালেফাত' বিষয়ের উপর। 'হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শান ও মকাম ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা বশীরুর রহমান, সদর মুরব্বী। মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী 'তরবীয়তে আওলাদ' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। 'বর্তমান সময়ে যুবকদের দায়িত্ব' বিষয়ের উপর জনাব ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম খান, সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর বক্তৃতার মাধ্যমে দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মাওলানা বশীরুর রহমান

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার ২.৪৫ মিনিটে মোহতরম ডঃ তারেক সাইফুল ইসলাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ এর সভাপতিত্বে অধিবেশন আরম্ভ হয়। জনাব তৌফিক আহমদ-এর কুরআন তেলাওয়াতের পর নযম পাঠ করেন জনাব এস এম রহমত উল্লাহ্। মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী 'সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)' বিষয়ের উপর বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। 'নামায ও দোয়ার কবুলিয়ত' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা সাহেবের 'ভারতে আহমদীয়ত' বিষয়ের উপর বক্তব্যের

তৃতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মাওলানা সালেহ্ আহমদ

পূর্বে উর্দূ নযম পাঠ করে শুনান সৈয়্যদ এম এ জোবায়ের। 'মৌলবাদ ও ইসলাম' এর উপর বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী। অধিবেশনের শেষ বক্তৃতা ছিল আলহাজ্জ রেজাউল করিম সাহেবের 'মোখালেফাত ও আমরা'। তিনি তেবাড়িয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট। সাম্প্রতিক এ জামাত কীভাবে মুখালেফাত-এর মোকাবেলা করেন এ ছিল তার বক্তব্যের বিষয়।

চতুর্থ অধিবেশন ঃ

৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার যথারীতি ৯.৩০ মিনিটে মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব নায়েব ন্যাশনাল-২-এর অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন আরম্ভ হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মনসূর আহমদ এবং উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব মুসলিম খন্দকার।

'দাওয়াত ইলাল্লাহ্ ও আমাদের কর্মপন্থা' বিষয়ের উপর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। 'ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক জনাব ডঃ তারেক সাইফুল ইসলাম সাহেব। জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেবের বক্তৃতার বিষয়-বস্তু ছিল 'আর্থিক কুরবানী ও নেযামে ওসীয়্যত'। 'হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও আহমদী জামাত' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হাফেয সেকান্দর আলী। মোখালেফাতের প্রত্যক্ষ শিকার বকশীগঞ্জের ওয়াকফে নও-শিশু সালেহ মোহাম্মদ সায়েম এবং নাসেরাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী সাহেব 'মুখালেফাত' ও আমরা'- বিষয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে তাদের উপর উপর্যোপরি হামলা ও নির্যাতনের হৃদয় বিদারক বর্ণনা উপস্থাপন করেন।

চতুর্থ অধিবেশনে ধর্মীয় নির্যাতনের বিবরণ দিচ্ছেন নাসেরাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী ওবকশীগঞ্জ জামাতের ওয়াকফে-নও শিশু সালেহ্ মোহাম্মদ সায়েম

চতুর্থ অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম

সমাপ্তি অধিবেশন ঃ

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় ৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা ২.৪৫ মিঃ। সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয কারী মাওলানা মুজিবুর রহমান। জনাব নাসের আহমদ ও জনাব জনাব তৌফিক আহমদ-এর দ্বৈত নযম পাঠের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয় মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী সাহেবের 'ফতোয়াবাজীর অন্তরালে' বিষয়ের মাধ্যমে। 'সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণে আহমদীয়া জামাত' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব। বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ করেন মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। সেক্রেটারী জলসা কমিটি জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেবের শোকরিয়া জ্ঞাপনের পর দোয়ার এলান পাঠ করে শুনান জনাব নিজামুল হক। হুযূরের প্রতিনিধি মোহতরম রাজা নাসির আহমদ সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জলসা গাহের একাংশ

উল্লেখ্য, এ মহান ঐশী জলসায় পাকিস্তান থেকে হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে মাওলানা রাজা নাসির আহমদ সাহেব, নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, মোহতরম মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা, আমীর পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

প্রত্যেক দিন রাত্রে বিশেষ তবলীগী প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানও অব্যাহত ছিলো।

দেশের এক ডজনের অধিক জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকায় এ জলসার খবরা-খবর ছবিসহ ছাপা হয়।

– প্রতিবেদক

শুভেচ্ছা বাণী

৭৬তম ন্যাশনাল সালানা জলসা উপলক্ষ্যে

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৭৬তম ন্যাশনাল সালানা জলসা উপলক্ষ্যে যেসব জামাত বা ব্যক্তি থেকে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট শুভেচ্ছাবাণী এসেছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলো ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানী-এর আমীর সাহেবের বাণী

আব্দুল্লাহ্ ওয়াগিস হাউসার

আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে, বাংলাদেশ জামাতের জলসা সালানা ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আপনি আমাদেরকে এতে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। জাযাকুমুল্লাহ্।

আমরা দুঃখিত যে, জার্মানী থেকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এটা বাংলাদেশ জামাতের ৭৬তম "সালানা জল্‌সা" হবে। এই থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারছি যে, বাংলাদেশের আহমদী ভাইয়েরা দীর্ঘদিন থেকে "জলসা সালানা" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌তাআলার কল্যাণ ও আশিস লাভ করে আসছেন। কিছুদিন পূর্বে আমরাও জার্মানীতে সালানা জলসা করেছি এবং তার পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আঃ)-এর উপস্থিতিতে ইউ.কে-তেও সালানা জলসা হয়েছিল।

আমরা জানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কাদিয়ানে জলসা সালানা আরম্ভ করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই জলসা সালানা শুধু কাদিয়ান নামক ভারতের এক ছোট গ্রামেই হত এবং পৃথিবীর বহুদেশ থেকে জামাতের সদস্যগণ এই আধ্যাত্মিক মহাসম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ছুটে আসতেন। যখন দেশ-ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামের দু'টি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হ'ল তারপর জলসা সালানা কাদিয়ান এবং রাবওয়া দুই জায়গায়ই হতে লাগলো। তখন অনেক দেশের আহমদীয়া জামাতসমূহ জাতীয় পর্যায়ে জলসা সালানা অনুষ্ঠান করতে লাগলো।

১৯৮৪ খৃঃ থেকে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ রাবওয়া এ "জলসা সালানা" করতে দিচ্ছেন না। আমরা দেখছি যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় এখন নতুন নতুন দেশে আহমদীরা জাতীয় পর্যায়ে জলসা সালানা করছেন। আজকাল এসব জলসার মাধ্যমে পুরাতন আহমদীগণ আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এবং হাজার হাজার নতুন আহমদী প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন জলসা সালানা আরম্ভ করলেন তখন তিনি এই জলসায় অংশগ্রহণকারীদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। আমরা আশা করি ও দোয়া করি যেন আল্লাহ্ সব দেশের জলসা সালানাসমূহের অংশ গ্রহণকারীদের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেন।

আমরা আশা করি আপনাদের জলসা সালানা বাংলাদেশের সকল আহমদীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

আল্লাহ্ আপনাদের উপর ফযল ও তাঁর পুরস্কার বর্ষিত করুন।

স্বাক্ষর - আব্দুল্লাহ্ ওয়াগিস হাউসার

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা-এর আমীর সাহেবের বাণী

নাসিম মেহেদী

আমি দুঃখিত যে, আমি আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণে অপারগ।কিন্তু দোয়া করছি আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁর ফযল ও কল্যাণ দ্বারা আপনাদের সকল প্রচেষ্টা সফল করুন এবং যেন আপনাদের বার্ষিক জলসা সুন্দর হয়।

আসলে আপনাদের জলসা তো সেই বার্ষিক জলসার একটি শাখা, যে "জলসা সালানা" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরম্ভ করেছিলেন। আমি দোয়া করছি তিনি তাঁর জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য যেইসব দোয়া করেছিলেন সেইসব দোয়া যেন আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যও আল্লাহ্ কবুল করেন।

দয়া করে আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ-কারীদেরকে (আমাদের ক্যানাডার জামাতের) ভালবাসা ও সালাম দিবেন। তাঁদেরকে আমাদের জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করবেন বিশেষ করে তবলীগ-এর ক্ষেত্রে সফলতার জন্য, জাযাকুমুল্লাহ্।

স্বাক্ষর- নাসিম মেহেদী

❑ মোহতরম ফিরোজ আলম সাহেব সদর মুরব্বী লন্ডন হতে ই-মেইল যোগে প্রেরিত এক পত্রে জামাতের সকল ভাইবোনকে মহব্বতপূণ সালাম জানিয়ে খাস দোয়ার দরখাস্ত করেছেন।

❑ ফ্রান্সের আমীর সেই জামাতের সদস্যবর্গের পক্ষ হতে বাংলাদেশ জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে সালাম দিয়ে দোয়ার আবেদন করেছেন।

❑ জাপান থেকে জনাব ইসমত উল্লাহ্ পিতা মাশরেক আলী মোল্লা আব্দুল্লাহ্ নাজুয়া ইন্টার্ণ জোনের জোনাল প্রেসিডেন্ট এবং কুকুওয়াকা জামাতের প্রেসিডেন্টও শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন।

সেক্রেটারী জলসা কমিটি

শুভেচ্ছা বাণী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেবের বাণী

ডাঃ ইফতিখার আয়ায

৪-৬ ফেব্রুয়ারী-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ৭৬তম সালানা জলসায় যোগদানের জন্যে আপনার ১৮ জানুয়ারী, ২০০০ তারিখের পত্রের জন্যে ধন্যবাদ।

যুক্তরাজ্যে পূর্ব-ব্যস্ততার জন্যে এ জলসায় যোগদান করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

জলসার সফলতার জন্যে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন নিবেন। এতে যাঁরা যোগদান করবে আল্লাহ্‌তাআলার আশিস তাঁদের ওপরে বর্ষিত হোক। আর আপনারা সকলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার কবুলিয়ৎ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করুন, আমীন।

জলসায় যোগদানকারীদিগকে আমার সালাম দিবেন এবং যুক্তরাজ্যে তাদের ভাইদের জন্যে দোয়ার অনুরোধ করবেন যাতে যুক্তরাজ্য জামাত তাদের এ বছরের কর্মসূচীতে সফলতা অর্জন করতে পারে।

ডাঃ ইফতিখার আয়ায
আমীর, যুক্তরাজ্য

সালানা জলসায় যে সব সন্তানদের পক্ষ থেকে আকীকা দেয়া হয়েছে তাদের জন্যে দোয়ার আবেদন ঃ

মিজবাহ্ উদ্দিন (সাদ)
পিতাঃ মোহাম্মদ মোসলেহ্ উদ্দিন
মাতা ঃ আতিয়াতুল ওহিদ (আলো)
ঠিকানা ঃ চেরাগআলী, টঙ্গী

নুসরাত জাহান রাফা
পিতাঃ মোহাম্মদ বুখারুল ইসলাম (বোখারী)
মাতা ঃ ফরিদা ইয়াসমীন (মৌ)
ঠিকানা ঃ ১০৬, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা

মাশহুদ আহমদ (ফাইয়াজ)
পিতাঃ মনসুর আহমদ
ঠিকানা ঃ জয়নগর, চট্টগ্রাম

সৈয়্যদ আহমদ তালহা রাহ্‌বার
পিতাঃ সৈয়্যদ আহমদ জাকারিয়া
মাতা ঃ মিসেস খালিদা ফারজানা

সৈয়্যদা সেগুফা সামামা মালিহা
পিতাঃ সৈয়্যদ আহমদ জাকারিয়া
মাতা ঃ মিসেস খালিদা ফারজানা
ঠিকানা ঃ ৭৫/বি,মালিবাগ চৌধুরীপাড়া

মোঃ ইউসুফ হুসাইন (অনিক)
পিতাঃ মোঃ ইব্রাহীম হুসাইন
মাতা ঃ মোসাঃ আমানাতুল হাই
ঠিকানা ঃ রাজাবাড়ী, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা

ফরিদ আহমদ (অভি) ও জান্নাতুল ফেরদৌস (আভা)
পিতাঃ মির্যা আসাদউল্লাহ্ গালিব
মাতা ঃ মিসেস সাবেরা নুসরত
ঠিকানা ঃ ৮৯/এ আর কে মিশন রোড
গোপীবাগ,ঢাকা-১২০২

মাহিয়া মরিয়ম (উপমা)
পিতাঃ মোঃ মাকসুদ উল হক
মাতা ঃ মিসেস নুরুন্নাহার
ঠিকানা ঃ ১০২/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাও, ঢাকা

কাযী সাবরীনা সুলতানা
পিতাঃ কাযী আব্দুস সবুর
মাতা ঃ নাসরিন বেগম
ঠিকানা ঃ মিরপুর-২, ঢাকা

নাসের আহমদ (সানি)
পিতাঃ বাহাউদ্দিন আহমদ
মাতা ঃ রাশিদা বেগম
ঠিকানা ঃ বরিশাল

ফাহিম আহমদ
পিতাঃ ডাঃ ফরিদ আহমদ
মাতা ঃ মাহমুদা আহমদ
ঠিকানা ঃ বরিশাল

আকিব
পিতাঃ মোশারফ হোসেন খান
মাতা ঃ মোবারেকা সিদ্দিকা (হাসি)
ঠিকানা ঃ পীরের বাগ, মীরপুর, ঢাকা

সুস্মিতা মীর
পিতাঃ মীর তারেক আলী
মাতা ঃ রাবেয়া ইয়াসমীন
ঠিকানা ঃ বাসা নং-৪০০, রোড নং-৬
বারিধারা, ঢাকা

সামীর নোমানী
পিতাঃ শিবলী নোমানী রাসেল
মাতা ঃ শাকিলা চুমকী
ঠিকানা ঃ কেলিফোর্নিয়া, আমেরিকা

সৈয়্যদা আজিজ বেগম
পিতাঃ ডাঃ সৈয়্যদ জিয়াউল হক
মাতা ঃ শওকত জাহান
ঠিকানা ঃ ঢাকা

জিনাত সুলতানা
পিতাঃ মোঃ জাহিদুর রহমান
মাতা ঃ মাহমুদা আকতার (রানী)
ঠিকানা ঃ মোহাম্মদপুর, ঢাকা

আবিদা সুলতানা
পিতাঃ মোঃ জাহিদুর রহমান
মাতা ঃ মাহমুদা আকতার (রানী)
ঠিকানা ঃ মোহাম্মদপুর, ঢাকা

মোঃ শাহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া
পিতাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ভুঁইয়া
মাতা ঃ মিসেস নাসিমা বেগম
ঠিকানা ঃ আশকোনা, ঢাকা

জাহিন ইসরাক আহমদ (হৃদ)
পিতাঃ ডাঃ জাফর আহমদ
মাতা ঃ জেসমীন জাহান (রীতা)
ঠিকানা ঃ ৯নং ইন্দিরা রোড
ফার্ম গেইট, ঢাকা-১২১৫

সৈয়্যদা তাস্‌নিয়া আহমদ
পিতাঃ সৈয়্যদ নাসিম আহমদ
মাতা ঃ মোসাঃ আফরোজা শিল্পী
ঠিকানা ঃ ১৩৪, সাংবাদিক কলোনী,
মীরপুর, ঢাকা

সামারুল আহসান
পিতাঃ কামরুল আহসান
মাতা ঃ নূসরাত বেগম
ঠিকানা ঃ মিরপুর-২, ঢাকা

মোঃ মোত্তালেব
পিতাঃ আইয়ুব আলী
মাতা ঃ চান বাহার
ঠিকানা ঃ কানাইনগর, নারায়ণগঞ্জ

মোজাহেদ আহমদ
পিতাঃ মেজর নাসিরুল হক
মাতা ঃ মিসেস নাইমা বেগম

আমাতুল মতীন
পিতাঃ মহিউদ্দিন আহমদ
মাতা ঃ ইয়াসমিন আহমদ

- সেক্রেটারী
জলসা কমিটি

মুক্তকণ্ঠ
The Muktakanth

আহমদীয়া

THE BANGLADESH OBSERVER
DHAKA TUESDAY FEBRUARY 8 2000

City News

Annual convention of Ahmadiyya Muslim Jamaat ends

Expressing profound gratitude to almighty Allah, the National Ameer of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh Meer Mohammed Ali said in the concluding session of the annual convention that Allah helps the Jamaat to conclude the programme with a grand success. He stressed upon that the convention founded by the Imam Mahdi (Alaihissalam) 110 years back to establish the dignity of Allah and Hazrat Mohammed (Peace & blessing be upon him) on the earth, says a press release.

Addressing on the topic "Behind Promulgation" Maulana Abdul Awal said that a section of people who are always busy to serve their own purpose they use religion as weapon and give promulgation and suppress and harrass innocent people in the society. He urged all conscious people to remain alert from such conspiring section.

The representative from the leader of the worldwide Ahmadiyya Muslim community, Raza Nasir Ahmad while addressing on the topic "Juncture of Millen... and Ahmadi...

Al-haj Meer ...mad Ali, National Ameer, Ahmadiya ... Jamaat, Bang... delivering presidential address ... concluding sess... (Salana Jalsa).

চাঁদনী বাজার
The Daily Chandni Bazar

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৪শে মাঘ, ১৪০৬

শহর ও শহরতলী

আজ (রবিবার)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ... ৭৬তম ন্যাশনাল সালানা জ... অধিবেশন, বিকাল ২টা ৪৫ ... বাজার রোড।

ভোরের কাগজ
ঢাকা রোববার ২৪ মাঘ ১৪০৬
৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক সম্মেলন শুরু

কাগজ প্রতিবেদক : আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৩ দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। বকশীবাজার রোডস্থ আহমদীয়া ... সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ... ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ ... । গত বছর ...

সংবাদ

আহমদিয়া জামাতের বার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন

প্রথম আলো

ঢাকায় আজ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত : ৭৬তম সালানা জলসা ২০০০-এর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান, সকাল সাড়ে ৯টা, বকশীবাজার আহমদীয়া মুসলিম কমপ্লেক্সে।

ভোরের কাগজ
ঢাকা শুক্রবার ২২ মাঘ ১৪০৬
৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০

এই দেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সালানা জলসা আজ শুরু

কাগজ প্রতিবেদক : আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৭৬তম ন্যাশনাল সালানা জলসা আজ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে। দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা, কুসংস্কার দূর ক... মানবতাবোধ, সন্ত্রাসমুক্ত সুশীল স... ও গণসচেতনতার লক্ষ্যে ৩... সম্মেলনের আয়োজ... বকশীবাজার রো... এ জামা...

সংবাদ
... শুক্রবার ২২শে মাঘ ১৪০৬
Dhaka : Friday 4 February 2000

তিনদি... ৭৬তম ... রোডস্থ ... হয়েছে। জুমার ... সম্মেলনের ... আলহাজ মী... ভাষণে ন্যাশ... আহমদীয়া ... শাহাদাতবরণক... স্মরণ করেন এ... করে বলেন, ই... ইনশাআল্লাহ বাংলা... জয়যাত্রাকে অব... আহমদীয়া জামাতে... কোরবানী, প্রচার, ... অগ্রগতির অবস্থা... কুষ্টিয়ার কুলদিয়ার, ... জামালপুরের বকশীগঞ্জ... স্থানেও আহমদীদের ও... উল্লেখ করেন। এর আগে স... চেয়ারম্যান মীর মোবাশ্বের... যোগদানকারী বাংলাদেশের... থেকে আগত প্রতিনিধিদে... অভ্যর্থনা জানান। উল্লেখ্য... আগামীকাল ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ... থাকবে।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

The Daily Star
Founder-Ed... : Late S. M. Ali
Dhaka, Fr... 4, 2000

What's ...

DHAKA, FRIDAY, FEBRUARY 04, 2000

The New Nation

Meetings today

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh: A 3-day long 76th Annual Convention will be held today at 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka on respec... ...t Ahmadiyya Centre, in ...

Friday, February 4, 2000

8/2/2000

THE FINANCIAL EXPRESS
28/1 TOYNBEE CIRCULAR ROAD, DHAKA-1000
Friday, February 4, 2000
Magh 21, 1406 BS : Shawal 26, 1420 Hijri

AMJ convention begins today

The three-day long 76th annual convention of Ahmadiya Muslim Jamat (AMJ) will begin today (Friday) at Ahmadiya Centre in the city, says a press release. Al-hajj Meer Mohammad Ali, ...meer of AMJ will inaugurate the ...vention at 3 PM.

প্রথম আলো
শুক্রবার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ৩ দিনব্যাপী বার্ষিক জলসা আজ শুরু

বাংলাদেশ আহমদিয়া মুসলিম জামাতের তিন দিনব্যাপী ৭৬তম বার্ষিক জলসা আজ শুক্রবার শুরু হচ্ছে। ঢাকার বকশীবাজারে দারত তবলিগ প্রাঙ্গণে বিকেল ৩টায় জলসার উদ্বোধন করবেন জামাতের ন্যাশনাল আমির আলহাজ মীর মোহাম্মদ আলী। জলসা শেষ হবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি। এতে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন। বিজ্ঞপ্তি।

বাংলার বাণী
শুক্রবার ২২ মাঘ ১...

ঢাকা
শুক্রবার ৪ ফেব্রুয়ারি ...

● আহমদীয়া মুসলিম ... : আজ শুক্রবার বিকেল ৩টা... বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ... বাংলাদেশ আহমদীয়া ... জামাতের তিনদিনব্যাপী সম্মেলনে... উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

প্রভাত

আহমদীয়া জামাতের সম্মেলন আজ থেকে

বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তিনদিনব্যাপী ৭৬-তম বার্ষিক জলসা (সম্মেলন) আজ শুরু হচ্ছে। রোববার পর্যন্ত ঢাকায় ৪ নং বকশী বাজার রোডস্থ দারত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বাংল. আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ মীর মোহাম্মদ আলী।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Jana...
ঢাকা ॥ শুক্রবার ২২ মাঘ ১৪০৬ বাংলা

আজকের ঢাকা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ॥ তিন দিনব্যাপী বার্ষিক জলসার উদ্বোধন সকাল ৯টায় বকশীবাজারস্থ দারত তবলীগ প্রাঙ্গণে।

দৈনিক উত্তরবার্তা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৬ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তিনদিন ব্যাপী ৭৬তম বার্ষিকী সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মাওলানা নাসির আহমদ।

বক্তারা বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত শুধুমাত্র আল্লাহ ও তার রসুল (সাঃ) এর ...ন ও মর্যাদা এবং প্রকৃত ইসলামকে ...ত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ

THE DAILY BANGLADESH
দৈনিক বাংলাদেশ
উত্তরাঞ্চলের প্রথম দৈনিক পত্রিকা

বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৭৬তম বার্ষিক সম্মেলনে (সালানা জলসার) সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৭৬তম বার্ষিক সম্মেলন সমাপ্ত

গত ৬ ফেব্রুয়ারী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তিন দিন ব্যাপী ৭৬তম বার্ষিক সম্মেলনের সমাপত্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী মহান আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলেন, শত প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যেও আল্লাহতায়ালা জামাতে আহমদীয়াকে ৭৬তম বার্ষিক সম্মেলনের সফল সমাপত্তি করতে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়ার বার্ষিক সম্মেলন (সালানা জলসা) কোন পীর-মাযারের ওরস বা মেলা জাতীয় কোন অনুষ্ঠান নয়। আজ থেকে একশ'দশ বছর পূর্বে আল্লাহতায়ালার নির্দেশে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর ও রসুল (সাঃ)-এর শান ও মর্যাদা প্রকৃত ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্মেলনের ভিত্তি রেখেছিলেন। সম্মেলনে যোগদানকারীদের ... আমীর সাহেব ... (আঃ)-এর অনুসারী ...

নয়; বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ... আহমদীয়াই প্রকৃত জেহাদে বিশ্বাসী। জেহাদ সাধারণত চার প্রকার (১) জেহাদ বিন নাফস (আত্ম সংশোধন) (২) জেহাদ বিল কুরআন, (তবলীগের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষাকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করা (৩) জেহাদ বিল মাল (আর্থিক কোরবানীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার) এবং (৪) জেহাদ বিস সাইফ (তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা) আহমদীয়া উল্লেখিত ৩ ... জেহাদই যথারীতি করে থাকে। ... যেহেতু শেষ শ্রেণীর জেহাদটি ... অনুসারে রহিত হওয়ার কথা ... আহমদীরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ... জিহাদের প্রয়োজন মনে করে না। সমাপ্তি অধিবেশনে 'ফতোয়াবা... অন্তরালে' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান ... বলেন, বাংলাদেশ 'ফতোয়াবাজী' ... কোন ঘটনা নয়, কিন্তু সংখ্যক স্বা... মৌলবাদী আর সুবিধাভোগী পলিটিসিয়ান এর মাধ্যমে সমাজের ...

দৈনিক দিনকাল
রোববার ২৪ মাঘ ১৪০৬ বাংলা

আহমদীয়া জামাতের বার্ষিক সম্মেলন শুরু

৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় ...ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ...বার্ষিক সম্মেলন ৪ নং বকশীবাজার ...আহমদীয়া কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে শুরু ...

...নামাজের পর দোয়ার মাধ্যমে ...উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল আমীর ...মোহাম্মদ আলী। সভাপতির ... আমীর গত বছর তুলনা ...জিদে বোমা হামলায় ...দের গভীর শ্রদ্ধার সাথে ...আত্মত্যাগ ... প্রকৃত ইসলামের ... রাখবে। তিনি ... উল্লেখযোগ্য আর্থিক ... বিভিন্ন ... ধরেন। তিনি ... দেশের অনান্য ... নির্যাতনের কথা ...

আজকের কাগজ
ঢাকা শনিবার ২৩ মাঘ ১৪০৬
Saturday 5 February 2000

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন শুরু

কাগজ প্রতিবেদক : নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যদিয়ে গতকাল আহমদীয়া কমপ্লেক্সে তিন দিনব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৭৬তম বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। আগামীকাল ৬ ফেব্রুয়ারি এ সম্মেলন শেষ হবে।

গতকাল জুমার নামাজের পর দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী।

দুর্জয় বাংলা ২
দুর্জয়
বগুড়া বুধবার ২৭ মাঘ ১৪০৬ বাংলা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সম্মেলন সমাপ্ত

গত ৬ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তিন দিনব্যাপী ৭৬ তম বার্ষিক সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী মহান আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলেন, শত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আল্লাহতায়ালা জামাতে আহ...কে ৭৬ তম বার্ষিক সম্মেলনের সফ...প্তি করতে সাহায্য করে... তিনি ব... জামাতে আহমদীয়া... সম্মেলন (সালানা জলসা) কে... মাযারের ওরস বা মেলা জা... অনুষ্ঠান নয়। আজ থেকে এক... পূর্বে আল্লাহতায়ালার নির্দেশে... ও তাঁর রসুল (সাঃ) এর শান... প্রকৃত ইসলামকে সমগ্র পৃ... করার লক্ষ্যে হযরত ইমাম মা... সম্মেলনের ভিত্তি রেখেছিলেন। সমাপ্তি অধিবেশনে 'ফতোয়... অন্তরালে' বিষয়ে বক্তব্য রাখ... মাওলানা আব্দুল আউয়াল খ...

বলেন, বাংলাদেশে 'ফতোয়াবাজি' নতুন কোন ঘটনা নয়, কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী মৌলবাদী আর সুবিধাভোগী ভিজেল পলিটিশিয়ান এর মাধ্যমে সমাজের নিরীহ লোকদের উপর বিভিন্ন ধরনের ফতোয়া আরোপ করে নির্যাতন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মান্ধ মৌলভীরা প্রকৃত ইসলামের অনুসারী আহমদীদের উপরও নানা ফতোয়া আরোপ করে নির্যাতন করে আসছে।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্জা তাহের আহমদ (আইঃ) এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসি... পবিত্র কুরআন ও ... সহস্রাব্দে সন্ধিক্ষণে ... এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ব ... বলেন, হযরত ... অনুযায়ী ...

আসছে সম্মেলন মুসলিম তাহের মাওলানা কুরআন 'সহস্রাব্দের এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ব আলোক পাত করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ... একবিংশ শতাব্দি ...

যুগান্তর
সোমবার ২৫ মাঘ ১৪০৬
Monday, 7 February 2000

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সম্মেলন শেষ হল

গতকাল আহমদীয়া মুসলিম ... দিনব্যাপী ৭৬তম বার্ষিক ... অধিবেশনে সভাপতির ... আমীর আলহাজ্ব মীর ... জামাতে আহমদীয়া ... বিশ্বাসী। ... অধিবেশনে 'ফতোয়াবাজীর ... বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাওলানা আব্দুল ... খান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ ... নতুন ...

মুক্তকণ্ঠ
The Muktakantha
ঢাকা, রোববার ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০০
২৪ মাঘ, ১৪০৬

আজকের ঢাকা

❑ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ : তিন দিনব্যাপী ৭৬তম সালানা জলসার শেষ দিনে দোয়া মাহফিল বকশীবাজার দারুত তাবলীগে দুপুর দু'টা ৪৫ মিনিটে।

The Independent
Magh 1406, 27 Shawal 142

APPOINTMENTS

DHAKA

❑ 03:00 pm: A grand convention of Ahmediya Muslim Jamaat will begin at Ahmadiya Centre 4 Bakshi Bazar Road.

আজ ঢাকায়

• আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আজ থেকে তিন দিনব্যাপী ৭৬তম বার্ষিক জলসা বকশিবাজার দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে, ...

দিনকাল
শুক্রবার ২২ মাঘ ১৪০৬ বাংলা

আজকের অনুষ্ঠান

❑ আহমদিয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ: ৭৬তম বার্ষিক জলসা, দারুত তাবলীগ প্রাঙ্গণ, বকশি বাজার রোড, বিকাল ৩টা।

মুক্তকণ্ঠ
The Muktakantha
ঢাকা, শুক্রবার ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০০
২২ মাঘ, ১৪০৬

আজকের ঢাকা

❑ আহমদীয়া মুসলিম জামাত : ৭৬তম বার্ষিক জলসা, ৪ নং বকশী বাজার রোড দারত তবলীগ প্রাঙ্গণে।

ভারতে আহমদীয়ত

হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিলহুদা ওয়া দিনীল হাক্‌কে লে ইউজহিরাহু আলাদ্দিনে কুল্লেহি ওয়া লাও কারিহাল মুশ্‌রিকুন (৬১ঃ১০) অর্থ ঃ আল্লাহ্ যিনি তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত সহ ও সত্য ধর্মসহ যাতে তিনি ইহাকে সর্ব ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন; মুশরিকদের নিকট যতই অপসন্দ হোক না কেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন; এসাবাতুন তাখ্‌জুল হিন্দা ওয়াহিয়া তাকুনু মায়াল মাহদীয়ে এসমুহু আহমদ।

অর্থ ঃ হিন্দুস্থানের মধ্যে যখন ভয়ঙ্কর বিপদ আসবে তখন সেখানেই ইমাম মাহদী আসবেন এবং তাঁর নাম হবে আহমদ (তারিখুল বুখারী) ।

অন্য হাদীসে আছে ঃ ইয়াখরুজুল মাহদীউ মিন্ কারিয়াতেন্ ইউ কালু লাহা কাদেয়া।

অর্থ ঃ মাহদী (আঃ) কাদিয়া নামক গ্রাম থেকে আবির্ভূত হবেন (জওয়াহেরুল আসরার পৃ: ৫৬)।

ফা তিলকা ইস্‌নাতানে ওয়া সাবউনা ফিরকাতান কুল্লুহুম ফিন্‌নার ওয়াল ফিরকাতুন নাজিয়া হুম আহলো সুন্নতিল বায়যা আল মুহাম্মাদিয়াতে আত্তারিকাতুন নাকিয়াতুন আহমদীয়তে (মিরকাত, শরাহ্ মিশকাত, ১ম খন্ড, ২০৪পৃঃ)।

অর্থঃ ঐ সকল ৭২ ফেরকা জাহান্নামী হবে। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ফেরকা হোল সেই সুস্পষ্ট আহলে সুন্নাত মুহাম্মদীর পথ যা আহমদীয়াত নামে আখ্যায়িত হবে।

সুতরাং ভারতবর্ষে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন হয়েছে আর সেই ভারত থেকে আপনাদের আহমদীয়ত তথা ইসলামের প্রসারতা শুনাচ্ছি। অতীতে ইসলাম যেভাবে ভারতে প্রসার লাভ করেছিল বর্তমানেও ভারতে এবং বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলায় সেভাবে আহমদীয়তে তথা প্রকৃত ইসলাম প্রসার লাভ করছে। (অভিনন্দন)

পাঞ্জাবের হরিয়ানা ও হিমাচলে এ যাবৎ ২-৩ লাখ , হায়দারাদে ৪ লাখ, উত্তর প্রদেশে ১২ লাখ, বয়াত গ্রহণ করেছে। পঃবঙ্গে ও আসামে ৮ লাখ ভাই জামাতে শামেল হয়েছেন। এমন অনেক মুসলিম ভাই যারা নিজেদের পরিচয় দিতে পারতেন না যাদের দু'টি করে নাম রেখেছিলেন একটি হিন্দু নাম যেমন দিলবাগ সিংহ আবার মুসলমানী নাম মোহাম্মদ সিংহ, চাঁদ সিংহ, চাঁদ মোহাম্মদ, দিলীপ চিত্রকর তাঁরা আজকের আহমদীয়ত কবুল করে তাঁদের ইসলামী স্বরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা আজ নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন।

আপনারা আনন্দিত হবেন, সারা ভারতের বয়াত টার্গেট অনুসারে বাংলার বয়াত বরাবর একের তিন বা একের চার ভাগ হচ্ছে। সে সঙ্গে যে টার্গেট হযরত খলীফাতুল মসীহ্ দিচ্ছেন তা পূরণ হয়ে যাচ্ছে এমন কি বেশীও হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে সারা বাংলা আসামের আহমদী আবাল বৃদ্ধ বণিতার সংখ্যা ছিল তিন হাজার আর হুযূর টার্গেট দিয়েছিলেন ২৭০০। আল্লাহ্‌তালার কি অসীম কুদরত বয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজার, তেমনি ১৯৯৪ সালে টার্গেট ছিল সাত হাজার বয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার; ১৯৯৫ সালে টার্গেট ছিল সাত হাজার, বয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় দশহাজার, ১৯৯৫ সালে টার্গেট ছিল কুড়িহাজার আমাদের বয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশহাজার। ১৯৯৬ সালে টার্গেট ছিল ষাট হাজার আমাদের সংখ্যা হয় ৯১ হাজার। ১৯৯৭ এ ছিল ২ লাখ আমাদের বয়াত দাঁড়ায় দুলাখ আটাশ হাজার তিনশ'। তেমনি ১৯৯৮-৯৯ টার্গেট ছিল ৫ লাখ খোদাতাআলা তা পূরণ করে দিলেন। এবছর ভারত থেকে টার্গেট ১ কোটি আমাদের বাংলা-আসামে ২৫ লাখ, দোয়া করুন আল্লাহ্‌তাআলা যেন তা পূরণ করে দেন।

খোদাতাআলার অফুরন্ত ফযল যে এ বছর জলসা সালানা কাদিয়ানে ২৬ হাজার প্রতিনিধির মধ্যে ১৬ হাজার নও মোবাইন ছিল এবং উত্তর প্রদেশ থেকে সাড়ে চার হাজার এবং পঃ বঙ্গ আসাম থেকে ১২ শতের অধিক প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। আর অত্যন্ত আনন্দের খবর এই যে, হুযূর (আইঃ) ঘোষণা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, কলকাতা থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন যাতে হাজারের অধিক যাত্রী (১১১৪ জন প্রতিনিধি) কাদিয়ান সম্মেলনে যোগদান করেন যা ভারত বিভাগের পর প্রথম সম্ভব হোল।

খোদাতাআলার ফযলে কেবল পঃবঙ্গ থেকে ১৫০-২০০ আলীম মুফতী, মোহাদ্দেস থেকে মুনশী পর্যন্ত বয়াত গ্রহণ করেছেন এবং ৭৫০ এর মত ট্রেনিং নিয়ে কর্মরত আছেন।

বর্তমানে ভারতের মাঝে আমাদের প্রচার ভূমিকা কেমন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

আমরা মানুষ। পৃথিবীর বুকে সকল জীবের সেরা। শুধু সেরা নয় সকল সৃষ্টি আমাদের জন্য সৃষ্ট। অতএব সকলের দেখাশুনার ভার আমাদের উপর অর্থাৎ আমরা সবার সেবক। একটি ছোট পিপীলিকা অথবা বৃহৎ হস্তী মানুষ জীবের ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। অতএব তাদের থেকে লাভবান হতে হলে তাদেরকে সুস্থ-সবল কর্মঠ রাখতে হবে

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের উন্নতির জন্য কার্পণ্য করেন নি। এই আলো, এই বাতাস, এই পানি, সবাইকে সমানভাবে দিয়ে যাচ্ছেন। নদী, নালা, পাহাড় পর্বত, তরু-লতা, শাক-সবজী ফল-মূল, আমাদের জন্য সর্বত্রই ছড়িয়ে রেখেছেন। মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ, পাখী, জীব-জন্তু দিয়ে আমাদের জন্য পৃথিবীকে সুশোভিত করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌র কি বিচিত্র লীলা।

মানুষকে দিয়েছেন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যা দিয়ে সে দেখে, শোনে, ঘ্রাণ, স্বাদ, অনুভূতি লাভ করে। যদি চক্ষু না দিতেন দেখতে পেতাম না, কর্ণ না দিতেন শুনতে পেতাম না, নাসিকা না দিতেন সুবাস ও গন্ধ অনুভব করতাম না, জিহ্বা না দিলে পদার্থের স্বাদ বুঝতাম না, তৃপ্তি পেতাম না। এই সেই মানুষ একদিন যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, পৃথিবীর কোথাও ছিল সে মিলিয়ে, তারপর পানি থেকে তা সৃষ্টি হলো, সে কথা বলা জানত না। সে কথা বলা শিখল। তার না ছিল খাদ্য, না ছিল পরিধেয়, না ছিল বাসস্থান। কে তাকে সৃষ্টি করেছে তা-ও সে জানত না, উলঙ্গ বন্য জন্তুদের মত ঘুরে বেড়াত, কে তাকে কীভাবে সভ্যতার আলো দান করল, ধর্ম শাস্ত্রগুলিতে এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে সমস্ত জীবের মত মানুষ-জীবাণু ছেড়ে দেওয়া হোল। ধীরে ধীরে সে তার অবয়ব প্রাপ্ত হোল, তারপর তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হোল তার সৃষ্টি-কর্তার। যেমন কুরআনে আছে ওয়া জায়ালনা মিনাল মায়ে শাইন হাই। অর্থ, সমস্ত প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়েছে (২১ ঃ৩১) তিনি যিনি (আল্লাহ্) মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন (২৫ ঃ৫৫) ঋক বেদে আছে ঃ তম অসিওমসা গূঢ় মল্লেহ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদ অর্থঃ

আদিতে সব কিছুই অন্ধকারে জলমগ্ন ছিল। নানা বিবর্তনবাদের পর তিনি (আল্লাহ্) তাদের রূপ দিলেন হাজার হাজার বছর পর (বিজ্ঞানীদের মতে)। যখন মানুষ অবসর প্রাপ্ত হ'ল তখন তাদের সভ্য করার জন্য সভ্যতা শিক্ষার জন্য আল্লাহ্ তাদের একজনকে ঐশীবাণী প্রেরণ করলেন তার চিরাচরিত নিয়মানুসারে অর্থাৎ ফেরেশতা বা দেবদূতদের সাহায্যে এবং ধীরে ধীরে সভ্যতার শিক্ষা দিলেন। যেমন কুরআনে আছে– ওয়া লাকাদ খালাক্নাকুম্ সুম্মা সাওয়ারনাকুম্ সুম্মা কুন্লা লিল্ মালায়েকাতেস্জোদু লে আদাম অর্থ ঃ (হে মানব জাতি) আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম পানি থেকে (২৫ঃ৫৫) তারপর তোমাদের রূপ দিলাম, তারপর আমরা ফেরেশতাদের (দেবদূতদের) বললাম, আদমকে মেনে নাও।

হিন্দু শাস্ত্রে সংহিতায় আছে –অবতারং করিষ্যামি তত্র মং সর্চয় প্রিয় অর্থ ঃ আমি অবতার (যে অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ রসূল) প্রেরণ করছি তোমরা তাকে অর্চনা বা মান্য করবে। এই আদি দেবের নাম ভবিষ্য পূরাণেও আদম বলা হয়েছে, যেমন, আদম নাম পুরুষ পত্নী হব্যবতী তথা।

এরপর আদমকে আল্লাহ্ সভ্যতার বুনিয়াদী বিষয়গুলি অবগত করালেন। তোমার জন্য রইল যে, তুমি ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গ হবে না, এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না ও রৌদ্র ক্লিষ্ট হবে না (২০ঃ১১৯)। এখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সঙ্গে জলসরবরাহের কথা উল্লেখ হয়েছে। বর্তমান কালে এই Water Supply এর কথার প্রাধান্য দেয়া হয়।

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে আনন্দ সংহিতায় আদি দেকে (আদমকে) বলা হয়েছে। নর নারায়ন বানররূপী নারায়ন অর্থাৎ ঐশীবাণী প্রাপ্ত প্রথম পুরুষ, যিনি এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করবেন। আল্লাহ্ বললেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইন্সা ইল্লা লে ইয়াবোদুন (৫১ঃ৫৭) অর্থ ঃ আমি মানুষ ও জিন্নকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত বা আরাধনার জন্য। আরাধনা বা উপাসনার দুইটি দিক; একটি আল্লাহ্র, অপরটি তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবা। বিশেষ করে মানব জাতির সেবা কুরআনে অন্যত্র বলেছে তারাই মুক্তি পাবে, বেহেশতে যাবে, যারা ওয়া আসানু ওয়া আমেলুসালেহা অর্থঃ যারা এক–অদ্বিতীয় নিরাকার বক্ষের–আল্লাহ্র ও সমাগত যুগাবতার বা যুগ সংস্কারকের উপর দৃঢ়-বিশ্বাস রেখে সৎ কাজ করতে থাকে।

ইসলাম ধর্মের এই নামায, এই রোযা , এই যাকাত, এই হজ্জ সবই জীব সেবার জন্য। আল্লাহ্র নিকট নানা পদ্ধতিতে বার বার যাচ্ঞা করা কারণ প্রতি মুহূর্তে কুমন্ত্রণাকারী শয়তানী চক্র আমাদের উন্নতির পথে বাধা দিচ্ছে। তাই দৈনিক অন্ততঃ আল্লাহ্র সাহায্য ভিক্ষার্থে পাঁচবার তাঁর নিকট প্রার্থনা করা, চাওয়া যাতে সেই সকল শক্তির উৎস আমাদেরকে শক্তি জোগান, বছরে একমাস রোযা বা উপবাস তাই শিক্ষা দেয়। সব রকমের মন্দ কাজ বর্জন ও সর্ব প্রকার কল্যাণের কাজের সংকল্প বাস্তব জীবনে রূপায়িত করা। এজন্য সব শাস্ত্রে এই প্রার্থনা (নামাযে যদিও পদ্ধতি পৃথক) এবং এই রোযা বা উপবাসের রীতি আছে। কিন্তু কালের প্রভাবে এবং সময়ের ব্যবধানে মানুষ দূরে সরে যায় বলে যুগাবতারের প্রয়োজন হয় এবং এজন্য আল্লাহ্ স্বয়ং এই অবতারের বা সংস্কারকের আগমন করান এবং তাঁর মাধ্যমে যুগের চাহিদা পূরণ করান।

এজন্য হিন্দু শাস্ত্রে এই অবতারকে মান্য করার বিশেষ তাগীদ দেওয়া হয়েছে যেমন,

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতী ভারত
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজন্যাহম
পরিত্রানয় সাধুনং বিনশয়াচ দুষ্কৃিতম
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে
(মেহাভারত-ভীষ্মপর্ব)।

অর্থ, যখন ধর্মে গ্লানি আসে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন সাধু ব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্টব্যক্তিদের দমন করার জন্য ও প্রকৃত ধর্ম স্থাপন করার জন্য প্রতি যুগে অবতার প্রেরিত হয়।

অবতার বা নবী বা সংস্কারকের দু'টি প্রধান কাজ। একটি হোল সৃষ্টি কর্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কীরূপ হওয়া উচিত এবং সৃষ্ট জীবের সঙ্গে তার সম্পর্ক বা কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত। এই কর্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য বিধান বা শরীয়ত বা নিয়মাবলী বর্ণিত হয়। যুগে যুগে এমনিভাবে অবতারগণ আগমন করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে। এবং মানুষকে তাদের দৈহিক মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির নিয়মাবলী শিক্ষা দিয়েছেন। তাই পৃথিবীর সকল নবী-অবতারকে শ্রদ্ধা করা ইসলামের বা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পয়গম্বরের একটি বিশেষ শিক্ষা। কুরআনে বলেছে,'লে কুল্লে কাউমিন হাদ' অর্থ প্রত্যেক গোষ্ঠীতে পথ-প্রদর্শক অবতার এসেছে (১৩ঃ৮)। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই সকল নবী-অবতারগণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করার রীতি ও বর্ণনা করেছেন যেমন, ইব্রাহীম মূসা কৃষ্ণকে ডাকতে হলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত কৃষ্ণ (আঃ) অর্থাৎ শ্রী বা মহান ইব্রাহীম তাঁর উপর আল্লাহ্র শান্তি, মহান বা শ্রী কৃষ্ণ তাঁর উপর আল্লাহ-ঈশ্বরের শান্তি বর্ষিত হোক।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এমনিভাবে ১লক্ষ বা ২লক্ষ ২৪হাজার নবী অবতার এসেছেন উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের সবাইকে সম্মান ও ভক্তি করতে আদেশ দিয়েছেন। তাঁদেরকে বড় ছোট মনে করে পার্থক্য সৃষ্টি না করারও উপদেশ দিয়েছেন; যেমন কুরআনে আছে বা আল্লাহ্র আদেশ হয়েছে ঠিক তেমনটি মান্য করার কথা বলা হয়েছে। আর ঐ সমস্ত অবতারগণের উপর যে সকল ঐশীগ্রন্থ এসেছে তাদেরকে সম্মান করার কথাও বলা হয়েছে।

যেমন ঃ এই রসূল মুহাম্মদ (সঃ) তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীগণ সকলে আল্লাহ্তে, তাঁর ফিরিশ্তা (দেবদূত)-গণে, তার গ্রন্থসমূহে (বেদ, গীতা, যেন্দাবেস্তা ত্রিপিটক, বাইবেল, তৌরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদিতে) তাঁর রসূলগণে (ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামচন্দ, কনফুসিয়াস, যরথুস্ত্র ইত্যাদিতে) বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা বলে আমরা তার অবতারগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না (২ঃ২৮৬)।

এই সকল অবতার নবীগণের একজনকেও অমান্য করলে মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিষ্য বা মুসলিম হতে পারবে না আল্লাহ্ এই নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন যারা আল্লাহ্ তার রসূলগণকে অবিশ্বাস করে এবং ইচ্ছা কোরে আল্লাহ্ ও রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে,'আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি, এবং এদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই আবিশ্বাসী কাফির (৪ঃ১৫)।

অতএব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষানুসারে পৃথিবীর কোন একজন নবী বা অবতারকে সে আরবের হোক, ইংল্যাণ্ডের হোক, আমেরিকার হোক, চীনের হোক বা জাপানের হোক, অবিশ্বাস করলে বা না মানলে সে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত বা মুসলিম হতে পারবেন না।

কুরআন এই অমোঘ বাণী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এই মহান শিক্ষা জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ানে আবির্ভূত যুগ-সংস্কারক হযরত আহমদ (আঃ) বিশ্বব্যাপী প্রচারে রত আছেন। এজন্য মৌলবাদী গোষ্ঠী এই জামাতকে সুনজরে দেখছে না এবং সর্বত্রই চরম বিরোধিতা শুরু করেছে। সত্যের প্রতিষ্ঠায় ও মিথ্যার লয় সাধনের জন্য জ্ঞানী-গুণীদের এগিয়ে আসা উচিত।

বর্তমান বিশ্বে বর্ণ বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ, ধর্ম বিদ্বেষ এলো কীভাবে। কীভাবে এত ধর্ম, এত দল, এত উপদল, সৃষ্টি হোল? কারণ মানুষত সেই পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ মানুষের আদি ও একই উৎস। আল্লাহ্‌ত বলেই দিয়েছেন–কানন্নাসো উম্মাতান ওহেদা অর্থ, মানব জাতি একই সম্প্রদায়, একই জাতি (২ঃ১১৪)। বিভেদ সৃষ্টি করল কে? মানুষেরাই। তাই আল্লাহ্‌ অবতারগণকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, এবং মানুষের মধ্যে সে বিষয়ে মতভেদ তার মীমাংসার জন্য (২ঃ২১৪)।

মানবের সৃষ্টি-কর্তা এক, মানব জাতি একই জাতি, একই সম্প্রদায় ভাই ভাই। তবে তাদের ধর্ম পৃথক হয় কীভাবে?

ধর্ম বৃক্ষের বীজ রোপিত হলো আদম বা নরনারায়ন কৃষি দ্বার আর তা হাজার হাজার অবতার মাধ্যমে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হোল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর আগমনে।

ঈশ্বর-আল্লাহ্‌ তার মাধ্যমে ঘোষণা করলেন ধর্ম পৃথক নয় ধর্ম হোল -'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম ধর্ম হিসাবে ইসলাম অর্থাৎ ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ (৫ঃ৪)।

এখানে ধর্মের বিবর্তনবাদের কথা বলা হয়েছে। ধর্ম পৃথক পৃথক বলা হয় নি। ধর্ম ধীরে ধীরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্ণ হয়েছে। আর এজন্য ঈশ্বর আল্লাহ্‌ ইতঃপূর্বে কোন ধর্মে নাম দেন নি। তাই দেখি পৃথিবীতে প্রচলিত যত ধর্ম আছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, জৈন ইত্যাদি। ধর্ম শাস্ত্রে ধর্ম হিসাবে এই নামকরণ কোথাও নেই। পরন্তু পরবর্তীতে নামকরণ হয়েছে। যেমন সিন্ধু থেকে হিন্দু, বুদ্ধ থেকে বৌদ্ধ, যীশু খৃষ্ট থেকে খ্রীষ্ট, জিন থেকে জৈন ইত্যাদি। বুদ্ধদেব কোন দিন তার ধর্মকে বৌদ্ধ, যীশুখৃষ্ট তার ধর্মকে খৃষ্ট রাখেন নি।

সুতরাং ধার্মিকের সংজ্ঞা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দিলেন, যে ব্যাক্তি নিজেকে পূর্ণভাবে ঈশ্বরে-ব্রহ্মে সমর্পণ করবেন লীন হবেন তিনি ধার্মিক, ব্রাহ্মণ বা মুসলিম হবেন।

আর এজন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে জানালেন ও প্রচার করতে বললেন, ধর্ম সম্বন্ধে বহু কথা। তিনি নূতন ধর্ম আনেন নি পরন্ত ধর্মের পূর্ণতা এনছেন। তিনি (আল্লাহ্‌) নির্ধারিত করেছেন তোমাদের জন্য সেই ধর্ম যা তিনি দিয়েছিলেন নূহকে আর যা আমরা প্রত্যাদেশ করছি তোমাকে এবং যা আমরা দিয়েছি ইব্রাহীম, মূসা ও যীশুকে এই বলে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তোমরা তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না (৪২ঃ১৪)। এখানে নূহ বলতে ভারতের বিখ্যাত মনুকে বলা হয়েছে আর ইব্রাহীম বলতে ব্রহ্মার কথা বলা হচ্ছে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বাইবেল বর্ণিত নোয়া হিন্দু শাস্ত্র বর্ণিত মনু এবং কুরআন বর্ণিত নূহ এজন্য একই ব্যক্তি যে, তার জীবনে প্লাবন ও নৌকায় আশ্রয় নেওয়ার কথা ও তাঁকে অমান্য করার কারণে ধ্বংস হবার কথা এইসব ধর্মশাস্ত্রে আছে। তেমনি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বাইবেল বর্ণিত 'আব্রাহাম' হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত 'ব্রহ্মা' এবং কুরআন বর্ণিত ইব্রাহীম একই ব্যক্তি এজন্য যে, তার জীবনে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং আগুনে তাকে কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারে নি।

যেমন উপনিষদে আছে : সর্ব জবেন তন্ন শশাক দগ্ধম অর্থ ঃ অগ্নি ব্রহ্মা তো দূরের কথা তার একটা পশমও দগ্ধ করতে সক্ষম হয় নি, তেমনি কুরআনে আছে। 'ইয়া নারোকুনি বরদাওঁ ওয়া সালামান আলা ইব্রাহীম :' হে অগ্নি তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও (২১ঃ৭০)।

ধর্ম যে ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট হবে এই আয়াত দ্বারা (সুতরাং) অনুসরণ কর তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের (ব্রহ্মার) ধর্মকে। তিনি (আল্লাহ্‌) পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন। মুসলিম আত্মসমর্পণকারী এবং এই গ্রন্থও করেছেন। যাতে রসূল মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হও (২২ঃ৭৯)।

সুতরাং পূর্বে যত অবতার পয়গম্বর এসেছিলেন সবাই আত্মসমর্পণের (ইসলাম) ধর্ম এনেছিলেন এবং তাদের অনুসারী শিষ্যরা সবাই মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী ছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বললেন, এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। তিনি (ইব্রাহীম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (১৬ঃ১২৫)। এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একদিকে যেমন নূতন ধর্ম আনেন নি পরন্তু ধর্মের পূর্ণত্ব দান করেছেন তেমনি ইব্রাহীম বা হিন্দু ভাইদের ব্রহ্মা পূর্ণ একেশ্বরবাদী ছিলেন।

আর এজন্য আল্লাহ্‌ অন্যত্র বলেছেন, পৃথিবীর যত নবী অবতার, এসেছেন সবাই-এর মূল শিক্ষা ছিল একেশ্বরবাদ বা তৌহীদ। যেমন আছে আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমারই উপাসনা কর' এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন রসূল বা অবতার প্রেরণ করি নি (২১ঃ২৬)।

সুতরাং পৃথিবীতে সকল অবতার এক নিরাকার ব্রহ্মের-আল্লাহ্‌র উপাসনার কথা বলেছেন এবং সবাই তাদের শিষ্যদেরকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকারী হোতে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ শয়তানী চক্রান্তে পড়ে বার বার ভুল করে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তার সৃষ্টির উপাসনা শুরু করে আর এজন্য আসেন যুগাবতার মানুষকে ঈশ্বরমুখী করার জন্য।

হযরত মূসা নবীর সামান্য অবর্তমানে কীভাবে তার শিষ্যরা এমন কি হারুন নবীর নিষেধ সত্ত্বেও সোনার একটা গোবৎস তৈরী করে তার পুজো শুরু করেছিল যা বাইবেলে ও কুরআনের উল্লেখ আছে। (সামিরী) ওদের জন্য এক গোবৎস গঠন করল–এক অবয়ব যা গরুর শব্দ করত। ওরা বলল, এ তোমাদের উপাস্য ও মূসারও উপাস্য কিন্তু মূসা ভুলে গেছে (২০ঃ৮৯)।

এ যুগে ঠিক এরূপ একটি ভুল বিশ্বাস মানুষের মাথা খেয়ে বসেছে। আর সে জন্য একজন সংস্কারকের আসার প্রয়োজন হয়েছে। পৃথিবীর আড়াই শত কোটি খৃষ্টান ভাই এবং একশত কোটি মুসলিম ভাই বলেছে হযরত ঈসা নবী যীশুখৃষ্ট যিনি দু'হাজার বছর পূর্বে এসেছিলেন তিনি নাকি সশরীরে আকাশে জীবিত অবস্থায় ৩৪ বছর বয়সে গিয়ে অদ্যবধি সেখানে জীবিত আছেন অর্থাৎ হাজার হাজার বছর পর জীবিত আছেন ; তিনি নাকি আবার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন।

এ যুগের যে কোন একটি বালক বলবে, আকাশ মহাশূন্যে সেখানে বাতাস নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই, অথচ একজন মরণশীল

মানুষ কীভাবে সেখানে বেঁচে থাকতে পারেন? এযাবৎ কেউ কাউকে হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতে দেখেনি, যীশু বা ঈসা নবী কীভাবে সেই মহাশূন্যে বেঁচে থাকতে পারেন।

একমাত্র খোদা দীর্ঘজীবী চিরস্থায়ী। জীবমাত্রই মরণশীল। মানুষের আয়ু হাজার বছর যেমন হয় না তেমনি বিনা খাদ্যে, বিনা পানীয়তে আকাশে কোথায় কীভাবে কেউ বেঁচে থাকতে পারেন।

কুরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে জীবমাত্র মরণশীল এবং কেউ দীর্ঘজীবী নয়। যেমন, "আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে দীর্ঘ জীবন দান করি নি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরজীবী হবে। জীব মাত্রই মরণশীল" (২১ঃ৩৫-৩৬)।

যদি ঈসা নবী-যীশু খ্রীষ্ট হাজার হাজার বছর জীবিত থাকেন তবে তাঁর ও আল্লাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য কি? অথচ হযরত ঈসা-যীশুখৃষ্ট একজন নবী একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি প্যালেষ্টাইন থেকে হিজরত করে আসার পর কাশ্মীর এলাকায় ১২০ বছর জীবিত থাকার পর সেখানে মৃত্যু বরণ করেন। কাশ্মীরের শ্রীনগরের খান ইয়ার স্ট্রীটে তাঁর কবর বিদ্যমান।

এই আজগুবি কল্পিত ঈসার কাহিনী বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ শুধু বিশ্বাসই নয় পরন্তু দৃঢ় প্রত্যয় করে আসছে এবং অনেকে তাতেই তাদের পরকালে মুক্তি লাভ হবে ও তারা জান্নাতের (স্বর্গের) সুখ ভোগ করবে বলে বিশ্বাস করে থাকে।

যুগের সংস্কারক এই কল্পিত কাহিনী বিবেক, বিজ্ঞান ও ইতিহাস এবং ধর্মীয় পুস্তক বাইবেল কুরআন হাদীস দিয়ে, মিথ্যা সাব্যস্ত করলেন ও যীশুর কবরের ফটো বিশ্বের কোণায় কোণায় পাঠালেন।

মুসলিম খ্রীষ্টান নির্বিশেষে আজ যীশুকে অর্থাৎ একজন মানুষকে খোদার আসনে আসীন করার কল্প-কাহিনী ত্যাগ করতে বসেছে।

মানুষ যতই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয় পার্থিব সকল মন্দ কাজ লড়াই, ঝগড়া, রায়ট, যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ পরস্পর দ্বেষ হিংসা ঐশী, গজব, মহামারী, ভূমিকম্প, প্লাবন, ঝড়, তুফান ইত্যাদি থেকে রেহাই পায় এবং ঐশী গুণাবলীতে ভূষিত হয়।

মানুষ যতই জড় পূজারী হয়ে পড়ে এবং ঈশ্বর থেকে দূরে বহুদূরে সরে যায় ততই মন্দ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। বর্তমান যুগই সেই জড় পূজারীর যুগ। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা জীবন্ত খোদাকে ছেড়ে জড় পদার্থ, মরণশীল মানুষ (যেমন যীশু), জড় শক্তির (আণবিক শক্তির) পূজারী হয়ে পড়েছে, ফলে সর্ব প্রকারের মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। জগতে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে ধর্মের নামে যে রক্তপাত হচ্ছে তা-ও পার্থিব মন্দ কাজগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ধর্মের অন্তরালে ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিষাক্ত করে তুলেছে। প্রকৃত ধর্ম ও তার আদর্শ ধর্মগ্রন্থগুলিতেই রয়ে গেছে। ছোবড়াগুলি নিয়ে ধর্মান্ধ মৌলবী, পন্ডিত, পাদ্রীরা সমাজকে কলুষিত করছে। আর এগুলিকে (ছোবড়া) মানুষ মূল ধর্ম মনে করে আস্ফালন করছে। ফলে সত্য ও অসত্যের লড়াই, দেব-দৈত্যের লড়াই শুরু হয়েছে। যদিও সত্য একদিন জয়যুক্ত হবে যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'সত্য এসেছে, মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে নিশ্চয়ই মিথ্যা দূরীভূত হয়েই থাকে' (১৭ঃ৮১)।

ধরা যাক আদম নবীর কাহিনী। খ্রীষ্টান এবং মুসলিম নির্বিশেষে পৃথিবীর সাড়ে তিনশ' কোটি মানুষ (দুই তৃতীয়াংশ) বলছে, আদম বেহেশতে ছিল, সেখানে নিষিদ্ধ জ্ঞান বৃক্ষের ফল (গন্দম ফল) খেল এবং গোনাহ্‌গার হোল। তখন খোদাতাআলা নাকি তাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। আর তার থেকে পৃথিবীর মানব জাতি শুরু হলো।

এখন প্রশ্ন হোল বেহেশ্‌ত বা স্বর্গ কোথায় এবং সেখানে আদম (মানুষ) কীভাবে কোথা থেকে এল।

বেহেশত বা স্বর্গ একটি আধ্যাত্মিক জগৎ। মানুষ মরার পর তার আত্মা চলে যায় সেখানে আর তার দেহ পড়ে থাকে পৃথিবীতে। মাটির সঙ্গে মরদেহ মিশে যায়।

জড় জগৎ যেমন আকাশ তারা নক্ষত্ররাজি ও সৌরজগত এবং পৃথিবীর বন জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, তরুলতা, নদীনালা সাগর, মহাসাগর পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ জলচর প্রাণী সকল সবই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা সনাক্ত করা যায়। কিন্তু বেহেশ্‌ত বা স্বর্গ জড় জগতের উর্ধ্বে তার অস্তিত্ব কোথায় জড় দেহধারী মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ধর্ম শাস্ত্রগুলিতে এবং অবতার নবীগণ তার বর্ণনা দেন মাত্র। মোট কথা জড় জগতের সঙ্গে অধ্যাত্ম জগতের সম্বন্ধ নেই বললে চলে। এখন এই আদম জড়দেহী কীভাবে বেহেশ্‌তে গেলেন এবং কীভাবে সেখানে থেকে ধরাধামে আসলেন, এত বোধের বাইরে। এটি একটি কল্প-কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

ধর্ম শাস্ত্রে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে আদম বা মানুষের জন্ম এই পৃথিবীতে পানি থেকে হয়েছে স্পষ্ট জানা যায়। তাই আজ আদম সম্পর্কিত অলৌকিক কাহিনী এখন বিজ্ঞান জগতের মানুষ কেউই মানতে রাজী নয়। এভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় মিথ্যা দূরীভূত ও বিলুপ্ত হয়।

ঠিক তেমনি ধর্ম প্রচার সম্পর্কে জেনে আসছি যে, ধর্ম মাত্রই বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম জবরদস্তিও প্রচারিত হয়েছে এবং বাহুবলে তরবারীর জোরে হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বদর, ওহুদ বা খয়বরের যুদ্ধ বলা হয় এই একই কারণে হয়েছে। কিন্তু নবীদের অবতারদের জীবন পাঠে এবং ধর্ম শাস্ত্র বিশেষ করে কুরআনের কোথাও কেউ দেখাতে পারবে না বা নবীদের জীবনে বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে কেউ দেখাতে পারবে না যে, তিনি বা তাঁরা কেউ জবরদস্তি ধর্ম প্রচার করেছেন। পরন্তু দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে হযরত মূসার জন্ম থেকে কীভাবে রাজাধিরাজ কংশ বা ফেরাউন নবীদের এবং তাদের আনীত শিক্ষাকে নির্মূল করতে চেয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তার শিষ্যদেরকে কীভাবে অত্যাচারের পর অত্যাচার করে মক্কা থেকে মদীনায় পালাতে বাধ্য করল জড় পূজারীরা। এমন কি তিনি মদীনায় গিয়েও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। পরন্তু সেখানে তার উপর কতবার যুদ্ধ চাপান হোল। ৪০০ কি.মি. দূর থেকে তাঁর ও তার প্রতিষ্ঠিত সত্য জামাতকে নির্মূল করতে বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনায়েন প্রভৃতি রণাঙ্গণে নামতে হলো।

যারা বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তরবারীর দ্বারা ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হবে। যদিও কুরআন ধর্মপ্রচারে জবর-দস্তি করার কড়া নিষেধাজ্ঞা আছে (২ঃ২৫৭)। মক্কা বিজয় হলো। মুসলিম সৈন্যদের হাতে অস্ত্র রয়েছে। মক্কাবাসীরা সকল অস্ত্র সংবরণ করেছে। তখনও হযরত বললেন না, তোমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ কর নইলে তোমাদের মস্তক তরবারী দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে তিনি বললেন, কোন প্রতিশোধ নয়, শুধু ক্ষমা আর ক্ষমা। দয়ার সাগর রহমাতুল্লিল আলামীনের কানে আওয়াজ এল সেনাপতি সাদ (রাঃ) এর, আজ প্রতিশোধ গ্রহণের দিন, আজ পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণেও যুদ্ধ করা সিদ্ধ। তিনি

বাধা দিয়ে বললেন, না, না, বরং বল, আজ ক্ষমা প্রদর্শনের দিন। অথচ তারা ১৩টি বছর মক্কায় অত্যাচার করেছে। অসহায় নও মুসলিমদের আবিসীনিয়াতে চলে যেতে হয়েছে এবং মদীনাতে বহু মুসলিমকে পূর্বে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে।

মুহাম্মদ (সঃ) যে যুদ্ধ করেছিলেন তা আত্মরক্ষামূলক ছিল ধর্মপ্রচারমূলক নয়। যেমন তিনি বলেছেন, 'তোমরা শত্রুর মোকাবিলা করার ইচ্ছা পোষণ কর না। আর আল্লাহ্‌র নিকট শান্তি কামনা কর। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করতে হয় তা হলে বীরের মত মোকাবেলা কর' (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)। এমনকি শিষ্যেরা প্রথম প্রথম অত্যাচারের আতিশয্যে প্রতিশোধ নেবার অনুমতি চাইলে তিনি বলতেন, 'আমাকে ক্ষমার আদেশ দেওয়া হয়েছে, কতলের নয়' (নিসায়ী)। নবাগত শিষ্যদের উপর অবিরল অত্যাচারে আল্লাহ্‌তাআলা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেন। যেমন, 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হোল তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে (২২ঃ৪০)। প্রত্যেক যুগে নবী অবতারগণকে এইভাবে যুদ্ধে নামতে অবিশ্বাসীরা বাধ্য করায়। যেমন মহাভারত (৫/৭২/৮৯) বাক্যে আছে,'সর্বথা যতমানা নাম যুদ্ধ মড়িকাম্মাতাম। সান্ত্বে প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্ধং না পরাক্রমঃ' অর্থ যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না করে শান্তির জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়েও যারা ব্যর্থ হয় তাদের জন্য যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।' ধর্ম প্রচারের জন্য না পূর্ববর্তী নবী অবতারগণ যুদ্ধ করেছেন না হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যুগে যুদ্ধ হয়েছে। এই যুগের এই প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে যে কোন মানুষ উপলব্ধি করতে পারেন। আহমদীয়া জামাত বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে যে ধর্ম প্রচার করছে তা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আনীত অবিকল ইসলাম যা পবিত্র কুরআনে, সুন্নতে ও হাদীসে আছে। যুগের মোল্লা-মৌলবাদীদের কল্পিত কৃত্রিম ধর্ম নয়। ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই মৌলবাদীরা এক জোটে এই জামাতের মানুষের উপর জোর-জবরদস্তি করছে যেমন-পাকিস্তানে মৌলবাদীদের পক্ষ নিয়ে জিয়া সরকার করেছে এবং ভারতে মৌলবাদীরা করছে।

পাকিস্তানে জিয়াউল হক রাষ্ট্রপতি হয়েও এক অধ্যাদেশ জারি করল ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে। অধ্যাদেশটি হোলঃ- কোন আহমদী মুসলিম তাদিগকে 'মুসলিম' বলতে পারবে না।, কাউকে 'সালাম' দিতে পারবে না। ধর্মস্থানকে 'মসজিদ' বলতে পারবে না। 'আযান' দিতে পারবে না ইত্যাদি।

ইসলামে বুনিয়াদী বিশ্বাস 'কলেমা' উচ্চারণ করতে পারবে না! কোথাও লিখতে পারবে না, স্টিকার হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না, মক্কায় তাদের হজ্জ পূর্বে বন্ধ করা হয়েছে। ফলে আহমদীদের জেল, জরিমানা ও শাস্তি ভোগ অসহ্য অত্যাচার ও মারধোর শুরু হোল। মসজিদ ভেঙ্গে ফেলল, দখল করে নিল, অনেককে গুলি করে হত্যা, বোমা ফেলে হত্যা,মাটি খুঁড়ে পাথর মেরে হত্যা করা হোল। চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হোল। রাস্তাঘাট অফিস আদালতে, স্কুল কলেজে সর্বত্রই আহমদীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু হোল।

ঠাট্টা বিদ্রূপের কারণ- আহমদীরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তাদের নবী বলে মানে না। তাদের নবী নাকি মির্যা গোলাম আহমদ। অথচ এটি একটি ডাহা মিথ্যা অপবাদ যা এ যুগের মৌলবাদীদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়। অথচ সত্যই এ যুগের মৌলবাদীদের সম্পর্কে ১৪ শত বৎসর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলে গেছেনঃ ওলামাও শারবো মান্ তাহাতা আদি মিচ্ছামায়ে' অর্থ তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নে সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্ট জীব হবে' (মিশকাত)।

অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের উপর এমন উদ্বেগ ও সংকটময় মুহূর্ত আসবে যখন তারা আলেমদের নিকট উপদেশ নিতে উপস্থিত হবে তখন আলেমদেরকে বানর ও শূকর সদৃশ দেখবেন (কনজুল উম্মাল)।

সত্যই আহমদী মুসলিমরা ইসলাম ধর্মের সমূহ বিষয় পূর্ণভাবে মানে ও পালন করে যেমনটি কুরআন, হাদীস ও সুন্নাতে (মুহাম্মদ সঃ-এর নিত্য জীবনে) আছে। যুগের মৌলবীরা তা সঠিকভাবে করে না পরন্তু বহু উল্টা বলে থাকে ও করে থাকে। তাই সংঘাত শুরু হয়েছে। পাঠক জামাতের প্রতিষ্ঠাতার মুখ নিসৃত বাণী থেকে আহমদীদের বিশ্বাস ও কর্ম দেখলেই উপলব্ধি করবেন।

'আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মাবূদ (উপাস্য) নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া, আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর (বিচার দিবস), জান্নাত (স্বর্গ) এবং জাহান্নাম (নরক) সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মরে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত এমন সকল নবী (অবতার) আলায়হেমুস সালাম এবং কেতাবের (ঐশী গ্রন্থসমূহের) উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহের প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়কে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্ম-মতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে (আইয়ামুস্ সুলাহ পৃঃ ৮৬-৮৭)।

প্রতিটি আহমদী মুসলিমকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় শেরেক করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, কামলোলুপ দৃষ্টি দেবে না। প্রত্যেক পাপ অবাধ্যতা, অন্যায়-অত্যাচার ও আত্মসাৎ, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ থেকে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন তার শিকারে পরিণত হবে না। প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়বে, ঈশ্বরের স্মরণে প্রার্থনা করবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক (দুরূদ পাঠ করবে) প্রার্থনা করবে। নিজ পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবে এবং তাঁর প্রশংসা-গীতি গাইবে, উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে এবং বিশেষ করে কোন আত্মসমর্পণকারীকে (মুসলিমকে) কোন প্রকার কষ্ট দিবে না। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে (খোদাতালার সঙ্গে) বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, আল্লাহ্‌র পথে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর

মীমাংসা মেনে নেবে। বিপদে পশ্চাদপদ হবে না পরন্তু সম্মুখে অগ্রসর হবে।

সমাজে যত রকমের কু-আচার চলে আসছে তা সব পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে চলবে না। পবিত্র কুরআনে সে সকল বিধি-নিষেধ আছে তা সম্পূর্ণভাবে পালন করবে। আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ (সঃ) যে সকল আদেশ দিয়েছেন জীবনের দৈনন্দিন কাজে তা অনুসরণ করে চলবে। ঈর্ষা ও অহংকার ত্যাগ করবে। দীনতা, বিনয় শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে জীবন যাপন করবে।

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্মান, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন থেকে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

আল্লাহ্-ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জনের জন্য তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণ নিয়োজিত করবো।

সত্য প্রসার লাভ করার জন্য জামাত ব্যাপক হারে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ-বিদেশে প্রচারক পাঠাচ্ছে। আহমদী বাচ্চাদের শিক্ষা যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আতফালুল আহমদীয়া, খুদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাইল্লাহ, আনসারুল্লাহ্ সংঘগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক (মুয়াল্লিম) পাঠিয়ে জামাতগুলিকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধর্মীয় বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা দিতে বিদ্যালয়, কলেজ, প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গরীবদের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। উদার শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কুরআন হাদীস এবং যুগাবতারের ৮৮ খানা পুস্তকের ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রকাশনা বিভাগ খোলা হয়েছে। বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) স্বয়ং ধর্ম বিষয়ে মানুষের বাড়াবাড়ী ও জবরদস্তি দূর করতে 'ধর্মের নামে রক্তপাত পুস্তক' 'বিশ্বশান্তিতে সমকালীন সমস্যা ও আন্তঃ ধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি' Revelation Rationality knowledge and Truth প্রভৃতি পুস্তক রচনা করে বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

যুগাবতার লিখিত 'শান্তির বার্তা' ইসলামের শিক্ষা পুস্তকগুলি শতাধিক ভাষায় প্রকাশ করে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

বিশ্বের কোণায় কোণায় জামাতে জামাতে পাঠাগার স্থাপন করার ব্যবস্থা করেছে। সমাজের বিকলাঙ্গ, অনাথ, বিধবা যাদের কোন সহায় নেই, ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া যাদের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব নয় তাদেরকে মাসিক মাসোহারার ব্যবস্থা করেছে। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মননশীল ব্যক্তিদেরকে সাহায্যে, ঋণদান করে অর্থনৈতিক কাঠামোর মান উন্নতি ঘটিয়ে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য প্রতি আহমদী সদস্যকে শতকরা আয়ের ৬.২৫ থেকে ১০ ভাগ চাঁদা দান অতি আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যাকাত দান, সদকা, ফিতরানা প্রভৃতি দানের দ্বারা অসহায়, গরীব দুস্থ রোগীদের ঔষধপত্র ক্রয়, অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণের জন্য সাহায্যেরও ব্যবস্থা আছে। জামাতের সদস্যদের চরিত্র গঠনের জন্য নিয়মিত মিটিং ও বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। জামাতের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী উমুরে আমা, আমীর, ও সর্বোচ্চ বিচারপতি খলীফা অবিরত নানা উপদেশ দান ও বিচারের ব্যবস্থা রেখেছেন।

যে রাষ্ট্রে বাস করে তার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার তার সংকটে সাহায্য এই জামাতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্লাবন, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে খলীফা লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন।

যখন পৃথিবী খলীফার অধীন হয়ে যাবে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তার অধীন হবে তখন সম্পদের অসম বন্টনের চির অবসান ঘটবে এবং পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থাকবে না। সেদিন মানুষ তার নিত্য জীবনের জরুরী অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান লাভ করবে। অত্যাচার, স্বৈরাচার, নিপীড়ন আর থাকবে না। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দৈহিক, নৈতিক, আত্মিক উন্নতির চরম শিখরে পৌছে যাবে।

যুগাবতার ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্ম, এই ভারতে হয়েছে। যেখানে প্রধান দু'টি ধর্মের মানুষ হিন্দু ও মুসলিম বসবাস করেন। যদিও অন্যান্য প্রায় সকল ধর্মের মানুষ কম সংখ্যায় আছে। তাই তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে যে মূল্যবান বাণী রেখে গেছেন তা দেওয়া হোল ঃ "বন্ধুগণ! আমাদের মধ্যে শতশত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা সকলে হিন্দুই হই আর মুসলমান হই বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখার ব্যাপার এক জোটভুক্ত। এইরূপে আমরা সকলেই মানুষ হিসাবে এক জাতি অর্থাৎ আমরা সকলে মানুষ বলে অভিহিত। তদ্রূপ একই দেশের অধিবাসী বলে আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী। অতএব, আমাদের কর্তব্য-বিমলচিত্ত ও শুভেচ্ছা নিয়ে পরস্পর বন্ধু হওয়া এবং পার্থিব ও পরমার্থিব বিপদাপদে একে অন্যের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করা যেন আমরা একে অন্যের শরীরের অংশ বিশেষ হয়ে যাই" (শান্তি বার্তা)।

সমগ্র মানব জাতির দ্বন্দ, কালোধলো ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা বড়ো-ছোটো, শত্রু-মিত্র. আপন-পর নির্বিশেষে সবাইকে ভাই ভাই করার জন্য, সকলকে একই সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, সবাইকে এক জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তাঁর দিকে আহ্বান করার জন্য যিনি (হযরত মুহাম্মদ (সঃ)) আসলেন সকল নবী অবতারের শিক্ষাকে সঞ্জীবিত করার জন্য (৫ঃ৪০) সেই শিক্ষা সেই ধর্ম স্থাপনের জন্য যিনি (হযরত ইমাম মাহদী) এসেছেন এবং মানবতা প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন। যদি আজ তার বিরোধিতা ও ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে মানবতা রক্ষার জন্য ঈশ্বর-আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁর কাহার (রুদ্র) মূর্তি অবশ্যই ধারণ করবেন এবং এক বিপর্যয়ের মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে মানবজাতিকে রক্ষা করবেন। তাই যুগাবতার আহমদ (আঃ) বললেন, "হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। যে দ্বীপবাসীগণ কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন, এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক। ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের (মনুর) যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শান্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে মৃত (হাকীকাতুল ওহী, ১৯০৬)।

-মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা
আমীর, পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম।

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(৪৩তম কিস্তি)

রক্ত বহির্ভূত সম্পর্ক

এ সম্পর্কের বাঁধন নানাভাবে সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে ভৌগলিক অবস্থান, ভাষাগত ঐক্য, একই ধর্মের অনুসারী, পেশাগত ঐক্য ও একই কর্মস্থান ইত্যাদিই প্রধান। শিশুকাল হতে এর শুরু এবং তা আজীবন চলতে থাকে। একত্রিত হয়ে শিশুরা খেলাধূলা করে। তাদের সবাই যে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত এমনটি নয়। ভৌগলিক সম্পর্কের পরিধিও কম নয়। একই পাড়া, গ্রাম, থানা, জেলা, বিভাগ, দেশ এসবের কল্যাণে আমাদের রক্ত বর্হিভূত সম্পর্কের প্রসার ঘটতে থাকে। একই মাতৃভাষার কারণে অজ্ঞাত অচেনাদের সাথে সম্পর্কের বাঁধন সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটি ছোট্ট উদাহরণ নিলেই বিষয়টির তাৎপর্য হৃদয়াঙ্গম করা যাবে। ধরুন কোন বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী জাপানে গিয়ে একাকী বেশ কিছুদিন কাটালো। পথ চলতে গিয়ে সে দেখলো একাধিক বাংগালী মাতৃভাষায় কথা বলছে। তখন তাদের সাথে বাংলায় কথা বলে সে যে কি তৃপ্তি পাবে তা বলে শেষ করা যাবে না। একই ধর্মের অনুসারীদের বেলাতেও একথা খাটে। একই হাট-বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা, বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সংযুক্ত হওয়া, একই স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ বহু কারণে মানুষের মাঝে বাঁধন সৃষ্টি হয়ে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

অবশ্য সব সময়ে আমাদের সব সম্পর্কই যে মিষ্টি মধুর হয় তা নয়। কখনও কখনও তিক্ততা এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদের কারণও হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শ মানুষকে সম্পর্কের ব্যাপারে পথ দেখিয়ে থাকে। নানা অত্যাবশ্যকীয় কারণে বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশ, জাতি, ভাষা ও ধর্মের লোক অহরহ একত্রিত হচ্ছে। এ অবস্থায় শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাসের পথ খুঁজে না পেলে বিশ্ববাসীকে অশান্তির অনলে দগ্ধ হতে হবে।

পরবর্তী আলোচনায় ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রথমে ব্যক্তি ও পারিবারিক এবং তৎপর বৃহত্তর সামাজিক বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হবে।

ইসলাম ও বিবাহিত জীবন ঃ

ইসলাম বিবাহের উপর যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে ইতোমধ্যে এর উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাতুন বাকারাহ্ ও সুরাতুল নিসাহ ছাড়াও আরো কয়েকটি সূরা মিলিয়ে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়াদির বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ না থাকায় প্রধান বিষয়গুলোতেই বক্তব্য সীমিত থাকবে।

বর্তমান বিশ্ববাসীকে যে আদমের প্রজন্ম বলা হয় তাঁকে আল্লাহ্ নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমেই নবুওয়তের ভিত স্থাপিত হয়। আল্লাহ্ তাঁকে বিবাহিত জীবনও দান করেন। হয়তো আল্লাহ্ অনুমোদিত ইহাই এই আদমের যুগে প্রথম বিবাহ। নবীরূপে হযরত আদম (আঃ)-এর আবির্ভাব বহন করে যে, তখন আরো লোক ছিলো। তা না হলে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তিনি শুধু মাত্র নিজের ও স্ত্রীর জন্যই নবী ছিলেন– কোন লোক বসতি বা কওমের জন্য নয়। স্বল্প কথায় এর উত্তরে বলা যায় পূর্বেকার আদমগণের সন্তানেরা ক্রমঃ উন্নতির মাধ্যমে যখন নবুওয়ত বুঝার ও নবীর অনুসরণের সামর্থ্য অর্জন করলো তখনি সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ নবুওয়তের পত্তন করেন। ইসলামি বিবাহের সূত্রপাতও বোধ হয় এ থেকেই শুরু হয়। কেননা, সকল নবীই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

এখানে হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য এবং স্ত্রীসহ কোথায় বসবাস করছিলেন কুরআনের ভাষায় (বাংলা তর্জমা) বলা যাক ঃ

'এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তাগণকে বলিলেন, নিশ্চয় আমি খলীফা নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি' (২ঃ৩১ আয়াতাংশ)। 'এবং আমরা বলিলাম 'হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী 'বাগানটিতে' বসবাস কর, এবং উহা হইতে যেখানে তোমার ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর, কিন্তু এই গাছটির নিকট যাইওনা, যাইলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।' (২ঃ৩৬)

এখানে বেশ কিছু বিষয় ভাববার আছে। যেমন 'জান্নাত' ও 'গাছ' সাধারণ অর্থে নয়, রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, বেহেশ্ত ও দোযখ আমাদের পরপারের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। তা'ছাড়া একবার বেহেশ্তে প্রবেশ করলে তা হতে বহিষ্কৃত হওয়ার কোন বিধান নেই। সাধারণ জ্ঞানেই অনুধাবন করা যায়, শয়তান বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে না। যদি তাই হতো তবেতো পৃথিবীবাসী হাফ ছেড়ে বাঁচতো। বেহেশ্তে এরূপ খারাপ গাছও থাকতে পারে না। যার কাছে গেলেও মানুষ যালেম হয়ে যেতে পারে এবং বেহেশ্ত হতে বহিষ্কৃত হতে হবে। যদি তা-ই হয় তবে তো বেহেশতে যাওয়া চূড়ান্ত বোকামি হবে। কেননা, ঐ গাছ বা এর বংশাবলী হতে বেহেশ্ত মুক্ত হয়েছে এরূপ কথা কুরআন হাদীসে আছে বলে তো মনে হয় না। প্রাকৃতিক বিধানে এর বংশাবলী বেড়েই যাওয়ার কথা।

এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে আর তা হলো একজন নবীই যেখানে আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ নির্দেশ ভুলে গিয়ে বেহেশ্ত হতে বহিষ্কৃত হলেন সেখানে অন্যান্যদের পক্ষে এই নিষেধ ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এসব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, এখানে 'জান্নাত' এবং 'শাজারা' রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ জান্নাত হলো এই পৃথিবীরই প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ কোন রম্য স্থান। আর শাজারা হলো কোন বংশ বা জাতি যার জন্য হযরত আদম (আঃ) প্রেরিত হন নি। সর্বোপরি বেহেশ্তে বিবাহের কোন প্রয়োজন থাকার কথা নয়।

যৌনপ্রেরণার সঠিক ব্যবহার ঃ

কুরআন নির্দেশিত বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন দিকের কথায় আশা যাক। আল্লাহ মানুষের যৌনপ্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবার ও সমাজগঠনমূলক কাজে লাগানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিবাহের বাইরে যৌন-প্রেরণা চরিতার্থ করাকে আল্লাহ্ অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখেন। এজন্য প্রয়োজনীয় শাস্তির কড়া বিধানও দিয়েছেন। ব্যভিচারের মত হারাম কাজের কাছে যেতেও মানা করেছেন। কুরআন বলে ঃ (তর্জমা) 'এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইওনা, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা' (১৭ঃ৩৩)।

ব্যভিচারের আগ্রাসন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে কীভাবে বিষাক্ত ও সুখ-শান্তিহীন করে ফেলে তা এ জামানার মানুষ হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছে।

বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, কাদেরকে বিবাহ করা যায় না এসব সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে বিস্তারিত বিধি-বিধান দিয়েছেন। কখন, কী অবস্থায়, কীভাবে এসব কার্য্যকর তথা পালন করতে হবে সে নির্দেশনাও রয়েছে। এখানে বিবাহ সংক্রান্ত যে কয়টি বিষয়ে আলোচনা করা হবে তা হলো ঃ (ক) মোহরানা ও যৌতুক (খ) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক (গ) বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও (ঘ) মাতৃদুগ্ধ পান।

(ক) মোহরানা ও যৌতুক ঃ

কুরআনের ৪ঃ৫ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ (বাংলা তর্জমা) 'এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের মোহরানা স্বেচ্ছায় প্রদান কর। অতঃপর তাহারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা সানন্দে ও তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর।'

মোহর হলো উপস্থিত জন সমক্ষে বিবাহে সম্মতি দেয়ার পর বর স্ত্রীকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে রাজী এবং স্ত্রী-ও মেনে নেয়। অবশ্য বিবাহ ঘোষণার আগেই আলাপ-আলোচনা দ্বারা উভয় পক্ষ মোহরানা স্থির করে নেয়। স্বামীর সামর্থ্য এবং সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার উপর অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে। যথাসত্ত্বর তা পরিশোধ করতে হয়। উপরোক্ত আয়াত হতে দেখা যাচ্ছে ইচ্ছা করলেও স্ত্রী স্বামীকে মোহরানার সবটা ছেড়ে দিতে পারে না। স্বামী কোন অংশই দাবী করতেও পারে না। বস্তুতঃ এতেই মোহরানার তাৎপর্য খুঁজতে হবে।

মোহরানাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে মানুষের যৌনপ্রেরণা ও বিবাহের আবশ্যকতাকে অনুধাবন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পরিবার ও সমাজ গড়ার জন্য আমরা আলাদা কোন মাল-মশলা পাইনি। এজন্য আমাদের অন্তর্নিহিত প্রেরণ-সমূহকেই কাজে লাগাতে হয়। এক্ষেত্রে যৌনপ্রেরণা খুবই গুরুত্ববহ। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে এ প্রেরণাকে সঠিকমূলক কাজে লাগানো হয়। নারী ও পুরুষ উভয়ই এই প্রেরণার অধীন। উভয়ের মিলনেই তা চরিতার্থ হয়। এতেই সন্তানের জন্ম হয়, প্রজন্ম রক্ষিত হয়। তবে স্রষ্টা মাতৃত্বকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, পিতৃত্বকে তা দেন নি। গর্ভসঞ্চারের জন্য নারী ও পুরুষের সমপ্রয়োজন। তবে গর্ভধারণ, সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং লালন-পালনের জন্য মা অপরিহার্য-পিতা নয়। স্বামী-স্ত্রী প্রথম মিলনের পর স্বামীর মৃত্যু হলেও সন্তান হতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হলে সন্তান হওয়া কখনও সম্ভবপর নয়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তথা বংশ রক্ষায় মার গুরুত্ব বাপের চেয়ে অনেক বেশী। সংক্ষেপে বলা যায় স্রষ্টা গর্ভধারণ, দুগ্ধদান ও লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়েছেন মা'র উপর। অপরদিকে পরিবারের প্রশাসন, ভরণপোষণের ভার ন্যস্ত করেছেন স্বামীর উপর। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ (তর্জমা) 'এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন অবশ্যই তোমাদিগের কর্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির' (৯২ঃ৪-৫)।

পারিবারিক জীবনে সুখ শান্তির নীড় গড়তে হলে স্বামীও স্ত্রী উভয়কে নারী পুরুষের মিল ও অমিলকে সামনে রেখে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেও সক্রিয় রাখতে হবে।

বস্তুতঃ সমাজ ও ধর্ম বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা দ্বারা যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণে আনার সাথে সাথে পিতৃত্বকে নির্দিষ্ট করেছে। এই প্রেরণাকে গঠনমূলক কাজে লাগানোর পথ প্রশস্ত করেছে। অবশ্য প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ মমতা এসবকেও অবহেলা করলে চলবে না। এসবকে চলমান ও প্রাণবন্ত রাখতেই হবে। (চলবে)

-মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

হিন্দু ধর্ম পরিচিতি ও ইসলামী দৃষ্টিতে হিন্দু ধর্ম

(৭ম কিস্তি)

সময়ের যাবতীয় লক্ষণ জগতপতি কল্কি অবতারের আগমনের স্বপক্ষে রায় দিচ্ছে। যাবতীয় লক্ষণ ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে অথচ আমরা তাঁকে খুঁজে পাবার কোন চেষ্টা করছি না, বরং পুরানো কুসংস্কার আঁকড়ে নিশ্চিন্তে বসে আছি। মহা ভারতের ভীষ্ম পর্বের গীতা অধ্যায়ে আছে --

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম্ ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহোম।
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় দুষ্কৃতাম
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

হে ভারত ! ধর্মে যখন গ্লানি সৃষ্টি হবে তখন ধর্মের পুনঃ অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে ধর্মের পুনঃ জীবনদানকারী সে আত্মার জন্ম হবে। সাধু ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশের প্রয়োজনে ধর্মকে পুনঃ সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে 'আমার' জন্ম হবে। 'আমার' জন্ম অর্থ দ্বাপরের দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের দেহসহ জন্ম নয়। তিনি নিজে জন্মগ্রহণ করার বা অন্যকে জন্ম দেয়ার মালিকও নন। তিনি নিজেই জন্ম-মৃত্যুর অধীন একজন মানুষ ও অবতার। "কিন্তু ইশ্বর বা ভগবান তাঁর জন্ম-মৃত্যু নাই, আদি ও অন্ত নাই। তিনি সর্বলোকের মহেশ্বর" (গীতা ১০/৩)। অতএব দ্বাপরের দেহধারী কৃষ্ণ অবশ্যই আসবেন না। তবে তার আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে পরবর্তীতে অন্য কোন অবতার আবির্ভূত হবেন। অবতারগণ পরম প্রভুর রং-এ রঙীন হয়ে নিজের মধ্যে প্রভুর চেহারা উদ্ভাসিত করে মানুষকে সে দিকে আকৃষ্ট করে থাকেন। খোদা প্রকাশের সকল পদ্ধতি একই। তাই অবতারে অবতারে কোন পার্থক্য নাই। দ্বাপরের কৃষ্ণের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা ছিল, কলির কৃষ্ণের মধ্যে সে আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই বর্তমান থাকবে। শুধু মাত্র হিন্দুধর্ম কেন পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম আজ গ্লানিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। পৃথিবীর সকল জাতির জনজীবন তা ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মনৈতিক রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি সকল পর্যায়ে দুর্নীতি দুষ্কৃতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সে জন্য কলির কৃষ্ণ কেবল হিন্দু নয় বরং জগতের সকল জাতির পরিত্রাণের ব্যবস্থা-পত্র হাতে নিয়ে আসবেন, যেমন ভাগবতে উল্লেখ হয়েছে--"অথাসৌ যুগ সন্ধ্যায়াং দস্যু প্রায়েষু রাজষুজনিত বিষ্ণু যশষী নাম্না কল্কি জগতপতি।" (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায় ২০ শ্লোক) অর্থাৎ কলিযুগসন্ধিকালে যখন দস্যুদের প্রাধান্য হবে, তখন বিষ্ণুযশ জগতপতি কল্কি আবির্ভূত হবেন।

হিন্দুধর্মের গ্লানির বিবরণ পূর্বে অনেকাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। কল্কিপুরাণ ১/৩৭ এ ভবিষ্যদ্বাণী আছে – "কলিকালে কৃষ্ণের অনেক নিন্দা হবে।"

সে মোতাবেক কৃষ্ণের কপালে নিন্দার গ্লানির ছাপ কিছু কম দেয়া হয় নি। হিন্দুরা তাঁকে একদিকে ভগবানের আসনে বসিয়েছে, অন্য দিকে চোর, লম্পট ব্যভিচারী, যৌনবিকার গ্রস্থ, অসৎ চরিত্রের অধিকারী প্রবঞ্চক রূপে তাঁকে প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করছে না। কালিন্দির কূলে গোপীবালাদের বস্তু হরণ, তাদের সাথে জল কেলি, রাধিকার সঙ্গে রাশলীলা, দোল পার্বণে রং মেখে ও মাখায়ে হোলিখেলা ইত্যাদি নিন্দনীয় ও কুরুচীপূর্ণ কাজ কখনই অবতার কৃষ্ণ কর্তৃক সংঘটিত হতে পারে না। ঋষি বঙ্কীম চন্দ্র বলেছেন- "কৃষ্ণ চরিত্র মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে" (রচনাবলী, ২য় খন্ড)।

মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনীর অন্তরালে লুকায়িত রাম, কৃষ্ণের মাধ্যমে ভগবত প্রাপ্তির আজ আর কোন সম্ভাবনা নাই। বাস্তবতা এ কথাই বলে যে, হিন্দ ধর্ম গ্লানিতে ভরপুর হয়ে একেবারে নষ্ট ও অনুসরণের অযোগ্য অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। অতএব অনুসন্ধিৎসু হিন্দু সাধু-সজ্জনদের জন্য ভগবৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আজ লুপ্ত। কল্কি আগমনের যুগকে চিহ্নিত করে মহাভারত বন পর্বে বলা হয়েছে - (১) "কেশগুলা" স্ত্রীয়ো রাজন।" হে রাজন স্ত্রীজাতি তখন অবগুণ্ঠন বিহীন হবে।

(২) ন কন্যাং ঘাচতে কঞ্চিন্যাপি কন্যা প্রদীয়তে স্বয়ং গ্রাহা ভবিষ্যতি যুগান্তে সমুপস্থিতে।" কোন অভিভাবক কন্যা দানও করবে না কনে প্রার্থনাও করবে না। কলিযুগে বর কনেরা আপনা আপনি পসন্দ করে বিয়ে করবে। (৩) "ম্লোচ্ছা চারা সর্বভক্ষা দারুণ সর্ব কর্মসু ভাবিন পশ্চিমে কালে মনুষ্যমাত্র সংশয়"? মানুষের অশুচীপূর্ণ বর্বরাচরণ হবে। সকল প্রকার অধার্মিক মন্দ আচরণকে তারা বরণ করে নিবে । তারা অস্পৃশ্য হবে। ভাল-মন্দ বৈধ-অবৈধ রুচি বিচার না করে সব কিছুই তারা ভক্ষণ করবে। সকল কাজেই তারা ভয়ঙ্কর হবে। 'সত্যং শিবং সুন্দরম' অর্থাৎ পরমেশ্বর যে পরম সত্য ও সুন্দর এ বিশ্বাস তারা হারিয়ে ফেলবে। ভগবান ও মানুষের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে মানুষ সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হবে।

(৪) "ক্রয় বিক্রয় কালে চ সর্ব সর্বস্য বঞ্চনাম যুগান্তে ভারতশ্রেষ্ঠ বিত্তলোভৎ করিষ্যতি।ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মানুষ বঞ্চনা প্রতারণার আশ্রয় নিবে। ওজনে কম দিবে। ওজনে বেশী নিবে। জাল-ভেজাল মিশিয়ে মালামাল বিক্রী দিয়ে অন্যকে ঠকাবে ও নিজে লাভবান হবে। নানা বাহানায় ঋণের টাকা আত্মসাৎ করবে। দেশের শ্রেষ্ঠ-স্থানীয়রা অর্থ-বিত্তের লালসার শিকার হবে।

(৫) "ন কাশ্চিৎ কস্য চিচ্ছাতান ন কশ্চিৎ কস্য চিদগুরু তমোগ্রস্থ তদালোকো ভবিষ্যতি জনাধিপ।" কেউ কারো কথা মানবে না, গুরুর উপদেশ অগ্রাহ্য করবে। কলিতে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। নিরাশা হতাশা অজ্ঞতা অহমিকার বশবর্তী হবে।

(৬) "হা হা কৃতা দ্বিজাশ্চৈবা ভয়ার্তা বৃশার্লাদিতা ত্রাতার মলোভ্যান্তো বৈ ভ্রমিষ্যান্তি মহিসিনাম।" মানুষের ভ্রমাত্মক অবস্থা দৃষ্টে সর্বসেবা জ্ঞানীজনেরা দুঃখে হায় হায় রব করবে।

মানুষের জীবনে শাস্ত্র বর্ণিত সকল অবস্থা চরম মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নাই যে, এ হীন অবস্থাকে অপসারণ করে মানুষ জাতিকে পুনঃ সত্য ও ধর্মের পথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কল্কির আগমন একান্ত জরুরী হয়েছে।

দিল্লী হতে 'তেজ' পত্রিকা ১৮ই আগস্ট, ১৯৩০ সংখ্যায় লিখেছে - "ভগবান কৃষ্ণের জন্ম মহাভারতের যুগ অপেক্ষা এখন বেশী প্রয়োজন - যদি ভাগবত গীতায় ভগবানের প্রতিশ্রুতি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে অবতারের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন রয়েছে বর্তমান কালে। অতএব ভগবান কৃষ্ণ এসো, জন্ম লও। পৃথিবী থেকে অপবিত্রতা দূর কর এবং ধর্মকে বিস্তারিত কর।"

পত্রিকা 'সুদর্শন চক্র' কিষণ নম্বর ২৯ আগষ্ট ১৯২৮ পৃঃ ২৫ এ বর্ণিত হয়েছে - "ভগবান তোমার অনাথ সন্তানদের কাতর আহ্বানে সাড়া দাও। জন্মষ্টমী এসে গেছে অথচ তুমি এখনও এলে না।"

কল্কির আগমন বিষয়ে ভাগবত পুরাণ ১৩ স্কন্দে বর্ণিত হয়েছে - "তখন সূর্য। চন্দ্র ও বৃহস্পতি এক রাশিতে। পক্ষে, নক্ষত্রে মিলিত হবে।" সে মোতাবেক চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ ১৮৯৪ সালে একবার ও ১৮৯৫ সালে আরেকবার ঘটে গেছে। আকাশের লক্ষণ আকাশের মালিক ভিন্ন অন্য কেউই সৃষ্টি করতে পারে না, রোধ করতে রুখতেও পারে না। এ গ্রহণদ্বয় দ্বারা আকাশের মালিক নিজেই তাঁর কল্কির আগমনের সত্যতার প্রমাণ প্রকাশ করে দিয়েছেন। পরম প্রভুর প্রকাশিত সাক্ষ্য-প্রমাণকে অস্বীকার করার আমাদের কোন অধিকার আছে কি ?

'হিন্দু' পত্রিকা ১৭ই এপ্রিল-১৯৩০ এ প্রকাশিত হয়েছিল-

"আব ওয়াক্ত মসিহাই হৈ গোকুলকে গোয়ালে বিমার তেরে নজামে লেতে হৈ সম্ভালে।

ওয়াদাপর তেরে জিন্দা হৈ আবতক তেরে সেদাই কিয়া দের হৈ আগুশে মহাব্বত সে বৈঠালে।"

'শ্রীরাম কৃষ্ণ ধর্ম চক্র' প্রকাশিত কল্কি পুরাণের অনুবাদে বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দ লিখেছেন- "বর্তমান সময়ে কল্কি পুরাণ সকলেরই কণ্ঠস্থ হওয়া উচিত। কারণ তিনি বর্তমান যুগেই অবতীর্ণ হবেন।"

জগত লাহা কৃত 'কল্কি আসছেন' পুস্তকের ৩, ১৫, ১৯, ২০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে - 'ধর্ম রক্ষক কল্কি ১৯৮৫ সালের মধ্যে অবশ্যই আবির্ভূত হবেন - ভবিষ্য পুরাণ, কল্কি পুরাণ, দেবী ভাগবত, মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম গ্রন্থে কল্কিদেবের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে- তিনি হয়ত ইতোমধ্যে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন - এখন ঘোর কলিকাল চলছে- কলিকালের শেষ পাদে তিনি 'ভারতবর্ষে' জন্মগ্রহণ করবেন।"

'ট্রিবিউন' পত্রিকা ৩ জুলাই, ১৮৯৯তে বলা হয়েছে "এই মহাপুরুষের আগমন হিন্দু পন্ডিতের মতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দ্ধারিত ছিল।" গ্রন্থ সাহেব তংগ মহল্যা গ্রন্থে গুরু নানক লিখেছেন- "ঐ মহাপুরুষের জন্ম ১৮৭৮ হতে ১৮৯৭ সালের মধ্যে হবে।"

হিন্দু ভাইয়েরা আপনাদের কল্কি জগতপতি কৃষ্ণ আপনাদের শাস্ত্রেরই বর্ণনা মোতাবেক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক বংশে বিষ্ণুযশ বা আহমদ নামে ভারতের সম্ভল অঞ্চলের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান গ্রামে ১৮ শতকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পুরা নাম মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। আল্লাহ্ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন- "আয় কৃষ্ণ রুদ্র গোলাপ তেরে মাহ্মা হো। তেরে মাহ্মা গীতামে মওজুদ হে।" হে কৃষ্ণ রুদ্র গোলাপ তোমার মহিমা প্রকাশিত হউক। তোমার মহিমা গীতাতে মজুদ আছে। আরও বলা হয়েছে - "ব্রাহ্মণ আওতার সে মোকাবেলা করনা আচ্ছা নেই।" ব্রাহ্মণ আওতার পর যো তীর চালাবে ওসী তীর সে ও আপ মারা যাবে।" ব্রাহ্মণ অবতারের বিরোধিতা করা ঠিক নহে। ব্রাহ্মণ অবতারের উপর যে তীর চালাবে সেই তীরে সে নিজেই মারা যাবে। পন্ডিত লেখরাম, সোমরাজ, ইচ্ছর চন্দর, ভগবতরাম দয়ানন্দ ইত্যাদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে ঐশী কোপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাই হিন্দু ভাইদের কাছে বিনীত আবেদন- আসুন অজ্ঞানতার অন্ধকার ও ধ্বংসের আর্বতে দিশাহীনভাবে ঘুরপাঁক না খেয়ে আমরা মানবসৃষ্ট মিথ্যা ধর্মমত পরিত্যাগ করে সমাগত অবতারের মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হই।

- শেখ জোনাব আলী

রাশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মূল ঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল মুনীর

(৭ম কিস্তি)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ বলেন ঃ "আমার দৃষ্টিতে মিস্টার গর্বাচেভ এ শতাব্দীর শেষ ভাগের মহান পথিকৃত। তিনি পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে বড়ই সাহসের সাথে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং পদক্ষেপের এরূপ ধারা জারী করে দেন যে, ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু যদি এ সকল পদক্ষেপের ইতিহাস তৈরীর পূর্বে মানবীয় প্রবণতা ভুল পথে চালিত হয় তবে স্বর্ণাক্ষরের পরিবর্তে লাল অক্ষরেও লেখা হতে পারে। এ জন্য পরিস্থিতি মূল্যায়নে অনেক সতর্কতার প্রয়োজন। আহমদীদেরকে খোদাতাআলা শান্তি স্থাপনের মাধ্যম বানিয়েছেন। আহমদীদেরকে কল্যাণ অন্বেষণকারী ও কল্যাণ লাভকারী বানানো হয় নি। বরং তাদেরকে কল্যাণ দান করার জন্য বানানো হয়েছে। যেহেতু আহমদীয়া জামাত এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা এ মহান মর্যাদা নিশ্চয় লাভ করবো, তাই এই বিষয়-বস্তুটি বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুধাবন করা জরুরী। আপনাদের নিকট আশা রাখি আপনারা সারা বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবেন এবং জগতের নেতাগণকে বলবেন এই মহান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাদের উপর কী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে" (আল্-ফযল ২২শে আগস্ট, ১৯৯০ইং)।

[নোট ঃ মিখায়েল গর্বাচেভ ইতিহাসে এরূপ একজন জবরদস্ত শাসকরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন যে, তিনি সাহস ও নির্ভিকতার সাথে সত্যকে জেনেছেন। তিনি এই ব্যবস্থার সকল ভুল-ভ্রান্তি নিজেই উন্মোচিত করে নিজ জনগণকে পৌণে এক শতাব্দীর সমস্যাবলী হতে বের করার দৃঢ় সংকল্প করেন এবং এরূপ সাহসিকতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে খুব কম শাসকের ভাগ্যেই জুটেছে। তিনি ছয় বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর পট পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি দুই ডজন দেশের কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্রের যাঁতাকল থেকে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি তাদের প্রত্যাশার বিপরীত রাশিয়ার রাজ্যসমূহের স্বাধীনতার দানবকে, যা বোতলে বন্দী ও অসহায় ছিল, স্বাধীন করার জন্য তড়িৎ বোতলের ঢাকনা খুলে দেন। এই দানব এখন শক্তিমত্তার সাথে বাইরে এসে গেছে। ইহা এখন কন্ট্রোলে আসার নামই নিচ্ছে না। গর্বাচেভের ছয় বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময়ে যেন পৃথিবীর পট পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং পৃথিবীর নতুন নক্শা উদ্ভাসিত হচ্ছে। এ সংবাদই আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৬ সালের জুলাইতে তাঁর এক কবিতায় দিয়েছিলেন, যখন এর কোন আশাও কারো ছিল না।

"পৃথিবীর পরিমণ্ডল পাল্টে যাচ্ছে। নতুন বিশ্বের সুন্দর ও চিরস্থায়ী নক্শার উদ্ভব হচ্ছে ও পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে" (কালামে তাহের, ১৯৮৬ইং)]।

পঞ্চম অধ্যায়

বার্লিন প্রাচীরের পতন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে উভয় পক্ষ ভয়ঙ্কর বোমা বর্ষণ করে একে বিধ্বস্ত করে দেয়। ১৯৪৫ সালের ৬ই মে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন সন্ধিপত্র লেখা হলো তখন বার্লিনকে দুই টুকরা করে দেয়া হলো। পূর্বের অংশ পেল রাশিয়া এবং পশ্চিমের অংশকে ব্রিটিশ, আমেরিকা ও ফ্রান্স জোন বানানো হলো। ১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্টে রাশিয়া তার এলাকার চতুর্দিকে কয়েক ফুট উঁচু পাকা প্রাচীর তৈরী করলো। এভাবে বার্লিন পৃথিবীর একমাত্র শহর যাকে প্রাচীরের মাধ্যমে বিভক্ত করা হয়েছে (এনসাইক্লোপেডিয়া, ব্রিটানিকা, দ্বিতীয় খন্ড)। ১৯৭৬ সালের আগস্টে সিয়েরালিওন থেকে ফেরার পথে এই অধমেরও এই প্রাচীর দেখার সুযোগ হয়। বার্লিন প্রাচীর এই লৌহ যবনিকার বাহ্যিক নিশান ছিল, যা সাম্যবাদী লোকদেরকে অন্যদের সাথে মিলামিশা করতে বাধা দিচ্ছিল। ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট স্যার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব রাশিয়া সফরে গেলেন। তখন তিনি সব চেয়ে বড় রুশ নেতা মিস্টার ক্রুশচেভের সাথে সাক্ষাতের জন্য ক্রেমলিন গেলেন। এ বিষয়ের উপর তাদের আলোচনা এভাবে হলো ঃ

জাফর উল্লাহ্ ঃ জনাব প্রেসিডেন্ট ! আজ পৃথিবীতে দু'জন ব্যক্তিই এরূপ আছেন যাদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তারা বিশ্ব-শান্তি নিজেদের মুঠোয় পুরে রেখেছেন। এ দু'জনের মধ্যে একজন আপনি। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি বিশ্ব-শান্তি বজায় রাখার জন্য আপনি কী করছেন ?

মিস্টার ক্রুশচেভ ঃ বর্তমানে বিশ্ব-শান্তির জন্য সব চেয়ে মুস্কিল ও জটিল সমস্যা হচ্ছে পূর্ব জার্মানী। যদি সঠিক উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করা যায় তবে বিশ্ব-শান্তির পথে সব চেয়ে বড় বাধা দূর হয়ে যাবে।

(তাহাদীসে নেয়ামত)

বস্তুতঃ ২৮ বৎসর পর ১৯৮৯ সালের ১০ই নভেম্বরের ঘটনাবলী এ কথার সত্যায়ন করলো যে, প্রকৃতপক্ষে এ সমস্যাই বিশ্ব-শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পূর্ব জার্মানীতে ইগেন গ্রীজ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত ইগেন গ্রীজ চতুর্থ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। নতুন প্রেসিডেন্ট এসেই জনগণের প্রতিক্রিয়া যাচাই করলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন যে, সরকার বিরোধী দলের নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য সদা প্রস্তুত। আলোচনার বিষয়-বস্তু ছিল দু'টি।

১। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের দরুন যে অভ্যন্তরীণ ফ্রন্ট কায়েম হয়েছিল তাতে কঠোরতা এসে গিয়েছিল।

২। সরকারের তরফ থেকে আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল।

আলোচনার পর পূর্ব জার্মানীর নতুন প্রেসিডেন্ট ইগেন গ্রীজ বার্লিনের উভয় অংশে যাতায়াতের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সমগ্র বিশ্বকে খুশী ও অবাক করে দেন। পূর্ব জার্মানীতে ৫২ বৎসর স্থায়ী প্রেসিডেন্ট ইগেন গ্রীজ-এর ঘোষণা জঙ্গলে আগুনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়লো। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যখন পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের প্রত্যেক নাগরিক কেবল একই কথা বুঝতে পারলো, তখন

১৯৮৯ সালের ১০ই নভেম্বর তাদের প্রত্যেকের হাতে লোহার রড ছিল যদ্বারা বার্লিন প্রাচীরের অস্তিত্ব বিলোপ করে। ইহার কয়েক স্থান স্বাধীনভাবে যাতায়াতের জন্য খুলে দেয়া হলো। লোকেরা হাতুড়ি, কুড়াল দ্বারা একে ভাংতে শুরু করে দিল। চল্লিশ বৎসর পর এ ব্যাপারটি পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিল। ইহাতো সম্ভবতঃ কখনো শুনা যায় নি যে, প্রাচীরও নিলাম হয়। কিন্তু এখন একজন আমেরিকান বললো, যদি প্রাচীরটি আমাকে দেয়া হয় তবে আমি পাঁচ কোটি ডলার দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যখন প্রাচীর পড়ে গেল তখন পূর্ব দিক থেকে পৌণে দুই কোটি জন সংখ্যার মধ্য হতে ত্রিশ (৩০) লক্ষ লোক পশ্চিম দিকে ধেয়ে আসলো। এ সকল লোক স্বাধীনতার আনন্দে নাচ ছিল এবং খুশীর গান গাইছিল। তারা তাদের স্বাধীনতায় যার-পর-নাই আনন্দিত হলো। কয়েক বৎসর পর তারা বাইরের দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখলো। ঐ সকল লোক, যারা বিগত ৬৮ বৎসরের দীর্ঘ স্নায়ু যুদ্ধে একে অন্যের সাথে পৃথক ছিল, তারা চারদিকে এই গান গাইছিল।

Such a Beautiful Day should last for ever.

(নিউজ উইক পত্রিকা : ২০শে নভেম্বর, ১৯৮৯ইং)

"এরূপ সুন্দর আনন্দের দিন সর্বদা থাকা উচিত। এত দ্রুত এই প্রাচীরের নাম নিশান মিটিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ হতবাক হয়ে গেল। তাদের স্বপ্ন ও ধারণায় ছিল না যে, এই অষ্টম আশ্চর্যকে এভাবে শেষ করে দেয়া হবে। বরং আমেরিকান পত্রিকা Time-ও একে Wall of Shame (লজ্জার প্রাচীর) নাম দিয়েছিল। Time লিখেছিল যে, "ভাল হয়েছে, ইহা শেষ হয়ে গেছে।"

শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই:) বলেন, "গত বৎসর এক খুতবায় আমি বার্লিন প্রাচীর পতনের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ঘটনাটি। বস্তুতঃ এই ঘটনা ঘটার পরের দিন সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকায় প্রধান শিরোনাম হল এই ঘটনাটি। (রাত্রে ঘটনা ঘটলো। পরের দিন সকালে পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশিত হলো)। সকল পত্র-পত্রিকা এই ব্যাপারটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছে যে, বার্লিন প্রাচীরের পতন হলো।"

Friday The 10th-এর নিদর্শন

যেদিন এ প্রাচীর ভেঙে দেয়া হলো তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল এবং পরের দিনের রাত্রি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইসলামী হিসাব অনুযায়ী ইহার তারিখ সূর্য ডুবার সাথে শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং একটি নতুন দিনের রাত্রি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী নতুন দিন, রাত্রি বারটায় শুরু হলো এবং তা পরের দিন রাত্রি বারটা পর্যন্ত জারী ছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তা ছিল ১০ তারিখ এবং জুমুআর দিন। পৃথিবীর যে সকল পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকটিতে "Friday The 10th" শিরোনাম লেখা ছিল। ইহার 'ডেটলাইন' তাই-ই হয়। মজার ব্যাপার ইহাও যে, ইহা ঐ 'ফ্রাইডে' যখন থেকে আমাকে কাশ্‌ফে এই ঘটনা দেখানো হয়েছিল। প্রথম ফ্রাইডে যাকে ইসলামী মাসের দিক থেকেও 'ফ্রাইডে দি টেন্থ' বলা যেতে পারে এবং সম্পূর্ণরূপে একে অন্যের সাথে মিলে গিয়েছিল। প্রথমত ইংরেজী তারিখের সাথে ইসলামী তারিখের মিলে যাওয়া কম ক্ষেত্রেই হয়। অতঃপর আরো কথা হচ্ছে কেবল তারিখের মিলই নয়, বরং জুমুআর দিন এই মিল হয় এবং এ দিনেই এই আশ্চর্যজনক ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল (আল্ ফযল, ৮ই মে, ১৯৯০ সাল)।

অবাক কাণ্ড এই যে, এ শতাব্দীর এ মহান ঘটনার সংবাদ খোদা পূর্ব থেকেই আহমদীয়া জামাতের হযরত ইমামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, "Friday The 10th"-এ এটা হবে।

অতঃপর পৃথিবীর নক্‌শা ও ব্যবস্থা পৃথিবীবাসীর আশার বিপরীতে বদলাতে শুরু করবে। এ খবরও তিনি তাঁর এক কবিতায় দিয়েছেন, যা ১৯৮৬ সালের ২৬শে জুলাই ইংল্যাণ্ডের সালানা জলসায় মোকররম চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব, উকিলুল মাল, পড়ে শুনিয়েছিলন (কবিতাটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেয়া হলো – অনুবাদক)

"পশ্চিম দেশ থেকে যারা যাচ্ছ তারা পূর্ব দেশের অধিবাসীদেরকে বলবে, কোন প্রবাসী মুসাফিরের আকাঙ্ক্ষার সালাম। আরো বলবে, তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প নিয়ে যে ধূলিঝড় উঠেছে খোদা সে ধূলি উড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। খোদার ব্যাঘ্ররা! জঙ্গলবাসীদের ভয় তোমাদের মানায় না। গর্জে সম্মুখে এগিয়ে যাও। সকল স্থান তোমাদের অধীনে নিয়ে এসো। পৃথিবীর পরিমণ্ডল পাল্টে যাচ্ছে। নূতন বিশ্বে সুন্দর ও চিরস্থায়ী নকশার উদ্ভব হচ্ছে ও পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

খোদা তোমাদের হাতে বিজয়ের চাবি ধরিয়ে দিয়েছেন। এখন আকাশে বিজয়ের চিহ্ন তোমাদের নামেই আঁকা হয়েছে। (কালামে তাহের)

নোট :- ১৯৮৯ সালের ১০ই নভেম্বর রোজ শুক্রবারে বার্লিন প্রাচীরের পরিসমাপ্তি হলো। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর দু'টি নকশাকে মিলিয়ে দিয়ে একটি নক্‌শায় পরিণত করা হলো। কমিউনিস্ট লোকদের সহিত বার্লিনের রাস্তা দিয়েই বাকী দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শুরু হলো এবং এ রাস্তা দিয়েই রুশ ভাষায় কুরআন মাজীদ ও অন্যান্য ইসলামী লিটারেচার ওয়াকফে আরজীর সদস্যদের হাতে, রাশিয়ায়, পৌছানো শুরু হলো। আজ হতে ঠিক সত্তর বৎসর পূর্বে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল্ মুসলেহ মাওউদ বার্লিনের গুরুত্ব অনুধাবন করে ছিলেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণাও দিয়েছিলেন (আল ফযল : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ সাল)।

একটি মহান সংবাদ

আহমদীয়া জামাতের চতুর্থ ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ বলেন :

"এখন আমি হযরত মুসলেহ মাওউদের একটি স্বপ্ন আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি, যা ১৯৪৭ সালের ৩০ মে আল্ ফযলে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের ভবিষ্যদ্বাণীতে রুশ বিপ্লবের উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে জার-এর ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এরপর অন্য একটি শক্তি রাশিয়া দখল করে নেবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদকে আল্লাহতাআলা এই সংবাদ দিলেন যে, এই দ্বিতীয় শক্তিটিও

এখন ধ্বংস হবে এবং ইহার পর পৃথিবীতে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হবে। বস্তত: হযরত মুসলেহ মাওউদ লেখেন :

"পরশু বা তরশু রাত্রে যখন আমার চোখ খুললো তখন বড় জোড়ের সাথে আমার হৃদয়ে এই বিষয়-বস্তু অবতীর্ণ হয়েছিল ইহা স্বপ্ন না, বরং একটি কাশ্‌ফী দৃশ্য বা (ইলহাম জাতীয় ব্যাপার) যে, ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে একটি সংশোধিত চুক্তি হয়ে গেছে এবং এর ফলে মধ্য প্রাচ্যের ইসলামী দেশসমূহে খুব অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে।"

তিনি বলেন :-

আমি মনে করি সংশোধিত শব্দটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, বাইরের চাপ ও কোনে কোন বিপদের দরুণ ইংল্যান্ড গোপনে রাশিয়ার সাথে এরূপ সমঝোতা করবে যদ্দরুণ মধ্য প্রাচ্যের উপর রাশিয়ার চাপ বেড়ে যাবে। এ সময় আমার মনে আসলো ইরাক ও প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার কথা। অর্থাৎ রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার দরুণ এ সকল দেশে ভীতি ও অস্থিরতা দেখা দিবে যে, যে ইংরেজরা কঠোরভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করছিল তারা কিসের ভিত্তিতে রাশিয়ার সাথে এই সমঝোতা করলো। শেষে চূড়ান্ত পর্যায় সম্পর্কে কুরআন করীম ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ নিশ্চিতভাবে হবে। কিন্তু কোন কোন সময় রাজনৈতিক প্রয়োজনে দুশমনের চাপকে হালকা করার জন্য বা তার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সরকার সাময়িকভাবে সন্ধি করে নেয় যাতে কোনো বিপদ না হয়। মনে হয় ইংরেজরা রাশিয়ার পক্ষ থেকে নিজেদের প্রতিরক্ষার বিষয়টিকে মজবুত করার জন্য বাধ্য হয়ে রাশিয়ার সাথে কোন সমঝোতা করে নিবে। রাজনৈতিক চাপ কোন কোন সময় বড় বড় ফল দিয়ে থাকে এবং সরকার কোন কোন সময় এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এরূপ মনে হয় ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা, যারা সর্বদা রাশিয়ার স্বার্থের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে, এখন তারা কোন কোন রাজনৈতিক অবস্থার বা প্রয়োজনের দরুন এই বিরোধিতা ত্যাগ করবে। অন্য দিকে রাশিয়াও, যারা কোন কোন ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সাথে বিরোধ রাখতো এখন তারা এদের বিরোধিতা পরিহার করবে।"

হযরত মুসলেহ মাওউদের এই কাশ্‌ফী দৃশ্য খুবই সবিস্তারে ও সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। এটা পড়ে অবাক হতে হয়। বিশেষভাবে ঐ তিনটি দেশ যাদের উপর রুশীয় শক্তির পতনের সবচেয়ে অধিক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তারা হচ্ছে ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন। হযরত মুসলেহ মাওউদকে আল্লাহতাআলা স্বপ্নে এই দেশগুলোকেই দেখিয়েছেন এবং এদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে চিন্তিত দেখানো হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আঃ)-এর ভাষণ, যা তিনি ১৯৯১ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর কাদিয়ানের সালানা জলসায় দিয়েছিলেন)

আমাদের দায়িত্বাবলী

আমাদের প্রিয় আকা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে' ১৯৯১ সালের ৬ই জুলাইতে কানাডায় প্রদত্ত তার ভাষণে বলেন :

" রাশিয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, খোদা রাশিয়ার রাজদন্ড আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। অতঃপর এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আমি আমার অনুবর্তীদেরকে ধূলিকণার ন্যায় রাশিয়ায় দেখছি। আমি মনে করি যখন ইহাই সময় এবং ইহাই যুগ যখন বাস্তবিক পক্ষে আমরা খুব দ্রুতবেগে রাশিয়ায় ইনশাল্লাহ্‌তাআলা ধর্ম বিস্তার করতে শুরু করবো।

যখন থেকে রাশিয়ার পতন হলো তখন থেকে রাশিয়া হঠাৎ এভাবে বসে পড়লো যেন তার মধ্যে কখনো প্রাণই ছিল না ইহার কিছু কুফল জগতের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিছু কুফল প্রকাশ হবে। আপাততঃ জগদ্বাসী মনে করছে যে, আমেরিকা ও তার সহযোগীদের অনেক বড় বিজয় হয়েছে বা Capitalism (পুঁজিবাদ) এর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ইহা সব চেয়ে বেশী নির্বুদ্ধিতার কথা। এ ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়েছে, যার মধ্যে আমরা বর্তমানে মজুদ আছি এবং ঐ ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ উভয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলশ্রুতিতে (একটি তো ভেঙ্গেই আছে এবং অন্যটি ভেঙ্গে পরার অবস্থায় আছে) যে অস্থিরতা দেখা দেবে তা সামলানোর সকল দায়িত্ব আহমদীয়া জামাতের।

আমাদের উপরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্বও আছে এবং বিশেষভাবে এই প্রজন্ম যারা আমাদের সম্মুখে বেড়ে যুবক হতে চলেছে এদের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। ইহার কারণ এই যে, আহমদীয়ত এখন উন্নতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে।

হযতর মসীহ মাওউদ আলায়হেসসালামকে খোদা শুভ সংবাদ দেন যে এখন নেক প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকেরা এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তাদের উপর ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হচ্ছে। আমরা এরূপ একটি যুগে প্রবেশ করছি যেখানে আমরা এ সকল ফিরিশ্‌তার অবতরণ নিজেদের চোখের সামনে দেখছি। এত অধিক সংখ্যায় জগদ্বাসীর আগ্রহ জামাতের দিকে বাড়ছে এবং এত দ্রুতবেগে দাবী আসছে যে, যদি আমাদের বর্তমান সনদ এভাবেই থাকে তবে জগদ্বাসীর প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব হবে। এক সাবেক U.S.S.R-এর ময়দানই এত বিস্তৃত এবং সেখানকার প্রয়োজন এত বেশী যে যদি জামাত তার বর্তমানের সকল সম্পদ সাবেক U.S.S.R-এর জন্য উৎসর্গ করে তবুও এ সকল প্রয়োজন মিটানো যাবে না।

হুযূরের এই নির্দেশের আলোকে শ্রদ্ধেয় ইয়াকুব আমজাদ সাহেবের আবেগের প্রতি লক্ষ্য করুন (তার আবেগভরা উক্ত কবিতার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেয়া হলো – অনুবাদক)।

"উঠো মহান বিপ্লব এসে গেছে। উঠো, মহান বিপ্লব এসে গেছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধঃগতির যুগ চলছে। না সাম্যবাদী ব্যবসা, না চীনা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দায়িত্ব আছে। কেবল আহমদের (সঃ) ধর্মই থাকবে চিরকাল। উঠো, মহান বিপ্লব এসে গেছে। উঠো, মহান বিপ্লব এসে গেছে।"

কার্ল মার্কস্ এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার

আমাদের ওয়াকফে জিন্দেগী বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ আযম সাহেব এ ব্যাপারে একটি হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "এই অধম খোদাকে হাজির নাযির বিশ্বাস করে পূর্ণ সত্তার সাথে নিবেদন করছি যে, ১৯৬৭ সালের শুরুর দিকের কথা, যখন কমিউনিজম সম্পর্কে অধ্যয়ন কালে দ্বান্দিক বস্তুবাদের সমষ্টিগত অবস্থার বিশেষভাবে "জগতের শ্রমজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হও" শ্লোগানটির প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এই ধারণার দরুন আমার মধ্যে একটি অস্থিরতা ছিল যে, সব

ধরনের সফলতা সত্ত্বেও এই শ্লোগানটি মানবজাতিকে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, অথচ :

তুমি এসেছ মিলন ঘটানোর জন্য,
বিচ্ছিন্ন করার জন্য নয়।

এক রাত্রে রাবওয়ার জামে আহমদীয়া হোস্টেলের নিজ কামরায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম যদি কার্ল মার্কসের কোন উর্দূ জানা প্রতিনিধির সাথে দেখা হতো তবে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে আপনারা কেন একে বিভক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন ?

চোখ লেগে গেছে। কিন্তু এমন মনে হচ্ছিল যে, জেগে আছি এবং জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। হঠাৎ এরূপ মনে হলো একটি বড় একতলা বাড়ীর বিশ্রাম কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদের লক্ষ্যে কার্ল মার্কস এর বাসস্থানে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়েছি। ডাকার পর ভিতরে গেলাম। একজন মধ্যবিত্তের ঘর যেমনটি হয় তার ঘর ছিল তেমনি ধরনের। আমার সম্মুখে ছিলেন সাদা বেশবিশিষ্ট এক বয়স্ক ব্যক্তিত্ব। তিনি আমার সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে ও আন্তরিক পরিবেশে দেখা করেন। কথাবার্তা শুরু হলো আমি তাকে আমার পরিচয় দিলাম এবং আমার অস্থিরতা সম্পর্কে জানালাম। তিনি সাদা-মাটা ভাষায় তার দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, এভাবে পরিবেশের গোটা মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।

আমি বললাম, এ যাবতকালের ঘটনাবলী আমাদের সম্মুখে আছে। তাতে মনে হচ্ছে এর বেশি সফলতা বন্ধ হয়ে গেছে। এ যাবতকালে অসম্পূর্ণ কৃতকার্যতার সাথেও অনেক মন্দ মিশে আছে। খুন-খারাবি, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ, হানাহানি ও লুণ্ঠন এবং মান-সম্ভ্রম নষ্ট করার পর এই দর্শনের প্রাথমিক ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশিত হয়েছে। সম্মুখে কি আছে তা দেখা যাবে।

এরূপ মনে হলো যেন তিন ঘন্টা পর্যন্ত সব বিষয় ও সব দলিল প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা হয়। কার্ল মার্কস সাহেব জোঁশ থেকে হুশের দিকে আসতে লাগলেন এবং কিছুটা নিস্তেজ হয়ে গেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বলুন তাহলে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কী করা উচিত ?

আমি উত্তর দিলাম যে, প্রত্যেককে সমভাবে মর্যাদা দিতে হবে এবং ঘোষণা করতে হবে 'জগদ্বাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও।" সাথে সাথে আমি কুরআন করীমের আয়াত "সব সম্মান আল্লাহ, রসূল ও মুমিনদের জন্য সংরক্ষিত" পড়লাম এবং বললাম, জাগতিক দিক থেকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সব চেয়ে সফলকাম ও উত্তম মানুষ। খোদা তাঁকে আদেশ দিয়েছেন, "বল আমি তোমাদের মতই মানুষ"।

এভাবে মানবতার মর্যাদার ইহাই দর্শন এবং ইহাই শিক্ষা। এর দ্বারা জগদ্বাসী এক হয়ে যাবে। ইহার বাস্তবায়নের সময় খুন-খারাবী, হতা ও ধ্বংসযজ্ঞ বা লুটতরাজের পরিবর্তে ভালবাসা, প্রেম, আন্তরিকতা, দোয়া, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ও সত্যিকারের সহানুভূতি উদ্বেলিত হয়ে উঠবে।

কার্ল মার্কস বলতে লাগলেন, এই বিপ্লবের পরিণতিও তো ব্যর্থতার আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তখন আমি বিস্তারিতভাবে আবেগের সাথে ইসলামের দ্বিতীয় উত্থান ও জাতিবর্গের প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমনের সাথে নতুন জমীন ও নতুন আসমানের সাতে নূতন ব্যবস্থা অর্থাৎ ওসীয়্যত ব্যবস্থার কথা বলি যে, ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অস্বচ্ছল ও অন্যান্য অক্ষম ব্যক্তিদের সকল দুঃখ কেবল খোদার ভালবাসা ও প্রেম এবং আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে দূর করা হবে আজ এই ব্যবস্থার অঙ্কুরোদগম হয়ছে এবং দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, এই ব্যবস্থাই সত্যিকারের সহানুভূতি ও ভালবাসার মিশ্রণে উদ্ভুত ঐ বিপ্লব যা গোটা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেবে।

এ সময় আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, কার্ল মার্কস সাহেব আমার কথার মধ্যে ডুব দিচ্ছেন এবং আমার কথায় মাথা নাড়ছেন। তার এই চিন্তা মগ্ন অবস্থায় দরজায় টোকা পড়লো। আমার জাগ্রত স্বপ্নের দৃশ্য শেষ হলো। আমি অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান সিক্ত হয়ে গেলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

নোট :- কাল মার্কসের শ্লোগান "দুনিয়ার মজুদর এক হও" এর আওয়াজ তো দাফন হয়ে গেছে। এখন জগতের মানুষ! উঠ ও ১৯৯৩ সালকে মানবজাতির কল্যাণের সাল বানিয়ে দাও। শ্লোগান রাশিয়ান স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ এর আওয়াজে সারা পৃথিবীতে একই সময় ধ্বনিত হচ্ছে এবং সুসংবাদ অনুযায়ী এই আওয়াজ পৃথিবীতে ছড়াতে থাকবে।

"সত্য দর্শনকারীর এই বিনীত আওয়াজ চতুর্দিকে সদা ছড়াতে থাকবে।" (চলবে)

অনুবাদক ঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা

মূল : মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (মরহুম)

ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার :

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে বুদ্ধি-দিপ্তী ও স্বাধীন সত্তা দান করে অন্যসব সৃষ্টি থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, আর কেবল তাকেই শরীয়ত (বিধি-বিধান)-এর বোঝা ও পুরস্কার ও শাস্তির অধিকারী করেছেন। কেননা, অন্যান্য সকল জীবনীশক্তিসম্পন্ন সত্তাকে এ রকম বৃদ্ধি ও সত্তা দান করেন নি। বরং এদের মধ্যে সকলে নিজ নিজ কতিপয় স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে ব্যস্ত ছিলো। আর তাদের জন্যে উন্নতির সোপানগুলো রুদ্ধ ছিলো কিন্তু মানুষকে আল্লাহ্‌তাআলা বুদ্ধি ও স্বাধীন-সত্তা দিয়ে এবং তার জীবনের উদ্দেশ্যকে ঐশী গুণাবলীর বিকাশক-এ পরিণত হয়ে এবং ঐশী নৈকট্য লাভ করার যোগ্য নির্ধারণ করে তার জন্যে সীমাহীন উন্নতিসমূহের অর্গল উন্মোচন করে দিয়েছেন। আর মানবীয় গুণাবলীর প্রেক্ষাপটে তার পথ প্রদর্শনের জন্যে নবী ও রসূলগণের ধারা প্রবহমান করেছেন যে, সে অবাধ্য শক্তিসমূহকে ও শয়তানী আহ্বানসমূহকে আর উহাদের কুপ্রভাব থেকে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে। আবার তার নিকট পুণ্য ও পাপের পথও ভালভাবে সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। এবং তার স্বাধীন সত্তাকে প্রত্যেক অবস্থায় সমুন্নত রেখে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন যে, পুণ্য ও পাপের উভয় পথের মধ্য থেকে যে পথকে চাও অবলম্বন করো। কেননা, ইহাই এমন একটি বিষয় ছিল যার কারণে তাকে পুরস্কার বা শাস্তিযোগ্য নির্ধারণ করা যেতে পারতো।

ধর্মে শক্তি প্রয়োগ সর্বদা শয়তানী চক্রের রীতি

আল্লাহ্‌তাআলা যখন থেকে স্বয়ং নবী ও রসূলগণকে পাঠানোর ধারা আরম্ভ করলেন, ঐ সময় থেকেই শয়তানী শক্তি-নিচয় ও অবাধ্য শক্তি-নিচয় সত্যের বিরোধিতাকে তাদের প্রথম উদ্দেশ্য বলে নির্ধারিত করে। সুতরাং যখন তিনি আদম (আঃ)-কে নবুওয়তের ভূষণে ভূষিত করেন তখন ইবলীস বলে ঃ

"এ কি সেই যাকে তুমি আমার ওপরে সম্মান দিয়েছো ? যদি তুমি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহলে নিশ্চয় আমি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতিরেকে তার বংশধরদের সকলকে আমার আয়ত্বাধীন করে নিবো"।

তিনি বল্লেন, দূর হ, কারণ তাদের মধ্য থেকে যারা তোকে অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তোদের সকলের এক পূর্ণ প্রতিফল;

আর তাদের মধ্য থেকে যাকে তুই পারিস তোর আওয়াজ দ্বারা প্রতারিত কর, এবং তুই তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ তাদের ওপরে চড়াও হ, আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে অংশীদার হ, এবং তাদেরকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দে।' প্রকৃতপক্ষে শয়তান প্রবঞ্চনা ব্যতিরেকে তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

নিশ্চয় যারা আমার বান্দা, তাদের ওপরে তোর কোন আধিপত্য খাটবে না। এবং তোর প্রভু অভিভাবক হিসেবে যথেষ্ট (সুরাতু বনী ইসরাঈল : ৬৪-৬৬)।

"সে বল্লো, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছো, অতএব অবশ্যই আমি তাদের জন্যে পৃথিবীতে (বিপথগামিতাকে) সুশোভিত করে দেখাবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো ,

তাদের মধ্য থেকে কেবল তোমার নিষ্ঠাবান বান্দা ব্যতিরেকে" (সূরাতুল হিজর : ৪০-৪২)।

হযরত আদম (আঃ)-এর পরেও বিরোধিতার এ ধারা অব্যাহত ছিলো, আর আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে যখন পৃথিবীতে কোন রসূল আগমন করতেন তখন শয়তানের দল তার বিরোধিতা করেছে। এবং তাঁকে ব্যর্থ করার জন্যে সর্ব প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অবলম্বন করেছে এবং তার ধ্বংসের পরিকল্পনা করতো। তাঁকে ও তাঁর ওপরে ঈমান আনয়নকারীদের নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানাতো। আল্লাহ্ প্রদত্ত আর ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রসাদকে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা ক্ষুণ্ন করতো। কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাস ও ঐশী গ্রন্থ একথার ওপরে ঐকমত্য যে, শক্তি প্রয়োগ দ্বারা নিজের কথাকে মান্য করানো শয়তানী চক্রের রীতি। আল্লাহ্‌তাআলা রসূলগণ এবং তাঁদের সম্মানীত শীষ্যমন্ডলী কখনও শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কাজ নেন নি।

কুরআন মাজীদ থেকে কতিপয় দৃষ্টান্ত

কুরআন মাজীদে বিগত নবীগণ ও তাঁদের বিরোধীদের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয় তাদের কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে" (সূরাতু ইউসুফ : ১১২ আয়াতাংশ)।

লোকদের উচিত তারা যেন পুণ্যবান লোকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং নবীদের শত্রু ও শত্রুর বিরোধীদের পথ থেকে বিরত থাকে।

হযরত আদম আলায়হেস সালামের পরে প্রথম মহান নবী ছিলেন হযরত নুহ আলায়হেস সালাম।

তিনি আল্লাহ্‌তাআলার বাণী তাঁর জাতির লোকদের নিকট পৌঁছাতে গিয়ে বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার (আনুগত্য)-করো। আর বল্লেন,

"নিশ্চয় আমি কোন একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে মানানো আমার কাজ নয়। কিন্তু তাঁর জাতি বল্লো,

"হে নূহ! যদি তুমি এই নতুন ধর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন না করো এবং তোমার বর্তমান মনোভাব না পরিবর্তন করো তাহলে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু দেয়া হবে" – আবার

হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম আবির্ভূত হলেন। আর তিনি স্বীয় জাতির লোকদের মূর্তি পূজো থেকে বারণ করলেন। দলিল-প্রমাণ দিয়ে এসব মিথ্যে উপাস্যদের দুর্বল ও হেয় প্রমাণ করেন। কিন্তু এতে তার জাতির লোকেরা পরস্পরে বল্লোঃ

"তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও। আর এভাবে নিজেদের উপাসকদের সাহায্য করো যদি তোমরা কিছু করতেই চাও (সূরাতুল আম্বিয়া ৬৯)। এভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আযরের সাথে কথা-বার্তা বল্লেন। সে উত্তর দিতে না পারায় বল্লো,

"যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করবো" (সূরাতু মারইয়াম:৪৭)।

হযরত লূত আলায়েহেস সালাম স্বীয় বিরুদ্ধবাদীদেরকে আল্লাহ্‌তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর আনুগত্য করার জন্যে বল্লেন।

তখন তারা উত্তর দিলো :
"যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি নির্বাসিতগণের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরাতুশ্ শূআরা : ১৬৮)।
আবার মাদইয়ানে হযরত শূআয়েব আলায়হেস সালাম আসলেন এবং তিনি লোকদের বল্লেন যে, আল্লাহ্তাআলাকে ভয় করে এবং আমার কথা মান্য করো। মাপ পূর্ণ করে দাও। কম করে দিও না। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এসব লোক তাঁকে এবং তাঁকে মান্যকারীদেরকে ধমক দিলেন। হযরত শুআয়েব আলায়হেস সালাম তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বল্লেন ,
"এবং তোমরা রাস্তায় রাস্তায় (এ উদ্দেশ্যে) বসে থেকো না যাতে তোমরা তাদেরকে ভয় দেখাও আর আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত রাখো যারা তাঁর ওপরে ঈমান আনে এবং উহাকে বক্র করার চেষ্টা করে। এবং স্মরণ করো যখন তোমরা স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করলেন। আর লক্ষ্য করো বিশৃঙ্খলা-কারীদের পরিণাম কী হয়েছিলো! (সূরাতুল আ'রাফ : ৮৭ আয়াত)।
কিন্তু তাঁর জাতির অহংকারী নেতাগণ জবাব দিয়েছিলো :
"হে শুআয়েব ! অবশ্যই আমরা তোমাকে ও ঐ সকল লোককে যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে, আমাদের শহর থেকে বের করে দেবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে"। সে বল্লো, "যদি আমরা অপসন্দ করি তবুও কি"? (সূরাতুল আ'রাফ : ৮৯ আয়াত)।
এর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তোমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষের ধর্ম থেকে মুরতাদ হয়ে ফিরে গেছো। এজন্যে আমরা তোমাদের বের করার পূর্বে তওবা করার সুযোগ দিচ্ছি। হযরত শুআয়েব (আঃ) তাদেরকে জবাব দিলেন যে, যদি আমরা তোমাদের ধর্মকে অপসন্দ করি তবুও ?
হযরত শুআয়েব (আঃ)-এর জবাব থেকে দু'টি কথা প্রকাশ পায়। প্রথমত : ইহা যদি আমরা তোমাদের ধর্মকে অপসন্দ করি তাহলে আমাদের দ্বারা ইহা কীভাবে হতে পারে যে, আমরা উহাতে ফিরে আসি। দ্বিতীয়ত: এই যে, অপসন্দ করা সত্ত্বেও যদি ফিরে আসি তাহলে তাতে তোমাদের লাভ কী ?
পুনরায় হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) আবির্ভূত হলেন এবং আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে ফিরআওনের নিকট প্রেরণ করতে গিয়ে বল্লেন,
"তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্র ব্যবহার করবে (সূরাতু ত্ব-হা : ৪৫ আয়াত)
যখন তারা আল্লাহ্তালার বাণী পৌছালেন তখন ফিরআওন ও তার জাতির নেতাগণ বলা আরম্ভ করলো,
"মূসার ওপরে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করে ফেলো এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখো ... এবং ফেরাউন তার সভাসদদেরকে বল্লো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও যেন আমি মূসাকে হত্যা করতে পারি আর সে তার প্রতিপালককে (সাহায্যার্থে) ডাকুক। নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে দেবে বা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে (সূরাতুল মু'মিন : ২৭ আয়াত)
আবার ফিরআওন ঐসব লোকদের উদ্দেশ্য করে বলে, যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিদর্শন দেখে ঈমান এনেছিলো ঃ
"নিশ্চয় ইহা এক গভীর ষড়যন্ত্র, যা তোমরা সকলে মিলে এ শহরে করেছো যাতে তোমরা সেখান থেকে এর অধিবাসীদেরকে বের করে দিতে পারো; অতএব তোমরা অচিরেই (এর ফল) জানতে পারবে :
নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত-পা (অবাধ্যতার জন্যে) আড়াআড়িভাবে কেটে দেবো। অতঃপর অবশ্যই তোমাদের সকলকে ক্রুশ-বিদ্ধ করবো"। তারা বল্লো, "আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ফিরে যাবো?" (সূরাতুল আ'রাফ : ১২৪-১২৬)।
আর জাতির সর্দারগণ ফিরআওনকে বল্লো, "তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে ছেড়ে দিয়েছো যেন তারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করে ?' সে বল্লো, 'নিশ্চয় আমরা তাদের পুরুষদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করবো আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখবো এবং নিশ্চয় আমরা তাদের ওপরে প্রবল রয়েছি" (সূরাতুল আ'রাফ: ১২৮)।
হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে হযরত ঈসা (আঃ) আসলেন। তিনিও আল্লাহ্তালার বাণী পৌছালেন এবং ইহুদীদেরকে তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা দিলেন। কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা আঁটলো এবং কুফুরীর ফতোয়া দিলো। সুতরাং মহাযাজক কায়ফা ইহা শুনে যে, সে মসীহ্ দাবী করেছে, বল্লো,
'এ ঈশ্বর নিন্দা করলো, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন ? দেখ, এখন তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে, তোমাদের কি বিবেচনা হয় ? তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, এ মরিবার যোগ্য। তখন তাহারা তাঁহার মুখে থু থু দিল ও তাঁহাকে ঘুষি মারিল, আর কেহ কেহ তাহাকে প্রহার করিয়া কহিল, হে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল, কে তোকে মারিল ?' (মথি – ২৬ : ৬৫-৬৮)।
" প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্তে তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল, আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকটে সমর্পণ করিল" (মথি : ২৭)। এবং বল্লো, 'সেই ব্যবস্থা অনুসারে তাহার প্রাণদন্ড হওয়া উচিত" (যোহন-১৯:৮)।
তাঁর শত্রু ইহুদীরা আরও বল্লো, "এ ভূতগ্রস্ত ও পাগল, ইহার কথা কেন শুনিতেছ ?" (যোহন –১০:২১)।
এমন কি যে, তারা বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ–কষ্টে জর্জরিত করার পরে তাঁকে (আঃ) ক্রুশে ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্তালা স্বীয় আশিসক্রমে তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন এবং বাধ্য হয়ে তিনি স্বীয় মাতৃভুমি থেকে হিজরত করেন।
তার শীষ্যদের মারপিট করা হতো ও আদালতে টেনে-হিঁচড়ে নেয়া হতো। তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো এবং মসীহর নাম নিয়ে কথা বলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিলো (প্রেরিত – ৫ :৪০)। তাদের মধ্যে কতককে হত্যা করা হয়েছিলো এবং কতককে খুবই নির্দয়ভাবে সঙ্গেসার করে দেয়া হয়েছিলো, এবং যিহুদা তাঁর শীষ্য স্তিফান-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দাঁড় করিয়ে যে, "আমরা তাকে মূসা ও ঈশ্বরের নিন্দাবাদ করতে শুনেছি"। আর প্রাচীনবর্গের ওপরে এবং অধ্যাপকগণকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কিয়ে মহাসভাতে নিয়ে যায়। এবং মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করায় এই বলে যে, এ ব্যক্তি ঐ পবিত্র স্থান ও শরীয়তের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত হচ্ছে না। এবং পরিশেষে তাকে শহরের বাইরে নিয়ে সঙ্গেসার করে দেয়" (প্ররিত –৭ : ৫৮)।
(চলবে)

অনুবাদ – মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

এম.টি.এ ডাইজেস্ট

[১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯ এর পূর্বে সম্প্রচারিত কিছু অনুষ্ঠান থেকে সংকলিত]

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদসমূহ পুনরুদ্ধার সম্পর্কে হুযূর (আইঃ)-এর মন্তব্য ঃ

১লা ডিসেম্বর সম্প্রচারিত (৩০শে নভেম্বর ধারণকৃত) বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে 'মুলাকাত' অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের পূর্ণ প্রতিলিপি পেশ করা হল ঃ

মিসেস আব্দুল হাদী ঃ বাংলাদেশে খত্‌মে নবুওয়তের মৌলবাদী মোল্লারা আমাদের বেশ কয়েকটি মসজিদ জবর দখল করে রেখেছে। এ ব্যাপারে সরকারও কোন কিছু করছে না। হুযূর, এ মসজিদগুলো উদ্ধার করার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন ?

হুযূর (আইঃ) ঃ আমরা কি এখনো এগুলো ফেরত পাইনি ?

মৌলানা ফিরোজ আলম ঃ জ্বি না হুযূর। হ্যাঁ, একটি মসজিদ আমরা ফেরৎ পেয়েছি।

হুযূর (আইঃ) ঃ কোন্ মসজিদটি ?

মৌলানা ফিরোজ আলম ঃ নাটোরেরটি।

হুযূর (আইঃ) ঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ারটি পাইনি ?

মৌলানা ফিরো আলম ঃ এখনো না।

হুযূর (আইঃ) ঃ সেই সকল পদক্ষেপই নেয়া হয়েছে যা আমাদের মত অসহায় মানুষের পক্ষে নেয়া সম্ভব। অসহায় এ অর্থে যে, দুনিয়াবী প্রচেষ্টার সাথে যতটুকু সম্পর্কযুক্ত; কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্যের সাথে যতদূর সম্পর্ক তাতে আমরা অসহায় নই। দুনিয়াবী সকল চেষ্টাই করা হয়েছে। বহু প্রতিবাদ লিপি পাঠানো হয়েছে, বিভিন্ন দেশের আমীরগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে। সরকারের ব্যাপারে আমরা নমনীয় হতে চাই এজন্য যে, আমরা জানি তাদের পক্ষে মোল্লাদের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া কঠিন। আর বাংলাদেশে মোল্লারা কেবল তখনই গুরুত্ব পায় যখন তারা আমাদেরকে নিয়ে কথা বলে। তা নাহলে তাদের তেমন প্রভাব থাকে না। তাই যেমনটি প্রবাদ আছে, Let the sleeping dog sleep সেই অনুসারে সরকার এ নীতি অবলম্বন করেছেন।

তারা কুকুরকে ঘুম তো পাড়িয়ে রেখেছেন। .....এটাই হ'ল সমস্যা। সুতরাং, আমাদের যা সাধ্যে আছে তা আমরা করছি। এর বেশি আর কিছুতো বলার নেই।

কুরআন মাজীদের মূল কপিগুলোর অবস্থান

একটি মজলিস-এ-ইরফান বা প্রশ্নোত্তর সভায় একটি কিশোর প্রশ্ন করেন, কুরআন করীমের প্রথম যে কপিগুলো হযরত উসমান (রাঃ)-এর সময়ে সংকলিত হয়েছিল সেগুলো কোথায় ? হুযূর (আইঃ) বলেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে খুব ভাল হয়েছে। এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য হুযূর (আইঃ) নির্দেশ দেন। পরের সপ্তাহে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন যার সারাংশ দেয়া হ'ল ঃ

বর্ণনামতে সেই সময় পাঁচ থেকে নয় কপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর মধ্যে দুই কপির সন্ধান এখনো পাওয়া যায়। একটি আছে তাশখন্দে, অপরটি ইস্তাম্বুলে।

তাশখন্দে যেটি সংরক্ষিত আছে শাহাদতের সময় এটিই হযরত উসমান (রাঃ)-এর হাতে ছিল। এর পাতায় উসমান (রাঃ)-এর রক্তের অনেক দাগ রয়েছে। সবচেয়ে বড় দাগটি পড়েছে 'ফামাকফীয়াহুমুল্লাহ্.....।' আয়াতটির উপর যার বিষয়-বস্তু এই যে, অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলাই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন।

বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এটিকে বসরায় দেখেছিলেন। ১৮৬৭ সালে এক রুশ জেনারেল একশত রুবল (রুশ মুদ্রা) দিয়ে সমরখন্দ থেকে এটি কিনে নেন এবং উপহার হিসেবে তাসখন্দের গভর্ণর কফম্যান (Kaufman) কে প্রদান করেন। এটি সেন্ট পিটার্সবার্গের রাজকীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত থাকে। ১৯০৫ সালে এর ৫০টি কপি তৈরী করা হয়। ১৯১৭ সালে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর লেনিন এটি মুসলমানদের হাতে অর্পণ করেন। এর ঐতিহাসিক দলিল ৯ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে লেনিনের লেখা চিঠিতে সংরক্ষিত আছে। ১৯৪১ সালে এটি যে মসজিদে রাখা ছিল সেখান থেকে একে একটি যাদু ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭৯ সালে তাসখন্দে কোন সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এক মুসলমানের হাতে অর্পণ করা হয়। এর কপি দেখা সম্ভব। ১৯৯৫ সালে আমাদের এক মুবাল্লেগ এটি দর্শন করেন। অপর এক মুবাল্লেগও কাঁচের মধ্যে দিয়ে এটি দেখেন। এর বর্ণনা হল– এতে ৩৫৩ পৃষ্ঠা। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টি লাইন। ভেতরের লেখা ৪০ সে. মি. X ৫০ সে. মি. পৃষ্ঠার মাপ ৫৩ সে. মি. X ৬৮ সে. মি.। লেখার ক্ষেত্রে 'কুফী' রীতি বা স্টাইল ব্যবহৃত হয়েছে। এরাবের কোন চিহ্ন অর্থাৎ যের যবর ও পেশ নেই। আয়াতের শেষে গোল (০) চিহ্নের বদলে হাইফেন (–) ব্যবহৃত হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হল, সূরাগুলোর বা-কায়দা নাম নেই। "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" দেখে সূরার শুরু সনাক্ত করতে হয়। তবে সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' নেই আর সূরা নমলে দু'বার আছে যেভাবে থাকার কথা।

অপর কপি, যেটি ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত, প্রথমে মসজিদে নববীতে সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য রাখা ছিল। পরবর্তী যুগে যখন মদীনার উপর আক্রমণ হয় তখন সেখানকার তুর্ক গভর্ণর বা জেনারেল ফখরী পাশা, যিনি ইতিহাসে Defender of Medina (মদীনার রক্ষক) রূপে খ্যাত, একে অনন্যোপায় হয়ে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করেন। এরপর খন্ডিত ইতিহাস যা পাওয়া যায় তাতে এক সময় বার্লিনে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে এটি উপহার দেয়া হয়। ভার্সাই এর চুক্তি (Treaty of Versailles) -এর সময় ছয় মাসের মধ্যে এটি হেজাযের রাজার কাছে হস্তান্তরের অঙ্গীকার করা হয়। এরপর কিছুদিন এটি বর্তমান সৌদী আরবে ছিল। বর্তমানে আবার এটি ইস্তাম্বুলেই আছে। কীভাবে সেখানে গেল জানা যায় নি।

এসমস্ত তথ্য পাঠিয়েছেন মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ, রাবওয়া থেকে এবং মৌলানা খালেদ আহমদ, মুবাল্লেগ, মস্কো।

আহমদী রাষ্ট্রে খলীফার স্থান

বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে 'মুলাকাত' অনুষ্ঠানে এ্যাডভোকেট জাফর আহমদের আহমদী রাষ্ট্রে খলীফার অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, কোন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা আরো বেশী সংখ্যায় আহমদী হয়ে গেলে খলীফা যে রাষ্ট্রের প্রধান হবেন এটি ঠিক নয়। খলীফাতুল মসীহ্‌গণ কোন রাষ্ট্রের প্রধান হবেন না।

তবে স্বভাবতঃই আহমদী রাষ্ট্রের প্রধান যদি আহমদী হন তবে খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতি অনুগত থাকবেন। রাষ্ট্র ইসলামী নীতি অনুসারে পরিচালিত হবে আর প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে যুগ-খলীফা তাঁর পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

বিকলাঙ্গ শিশুর ক্ষেত্রে গর্ভপাতের উপর আলোকপাত

আরেক অনুষ্ঠানে এ্যাডভোকেট জাফর আহমদ তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আজকাল সন্তান গর্ভে থাকতেই আল্ট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে জানা সম্ভব যে, সন্তান বিকলাঙ্গ হবে কিনা। যদি সন্তান বিকলাঙ্গ হয় বা এরূপ আশঙ্কা থাকে তবে কি গর্ভপাতের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে ?

হুযূর (আইঃ) এর উত্তরে বলেন যে, এ ক্ষেত্রেও নীতি সেটিই যা সাধারণভাবে গর্ভপাতের জন্য প্রযোজ্য। সন্তানের মাতৃগর্ভে এমন একটি পর্যায় থাকে যখন গর্ভের বাইরে আসলে সে বাঁচতে পারে না। এ অবস্থায় প্রয়োজনবোধে গর্ভপাতের অনুমতি আছে। কিন্তু মাতৃগর্ভেই একটি নির্দিষ্ট সময় পরে এমন একটা পর্যায় আসে যখন গর্ভের বাইরেও তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব। অপরিপক্ক (premature) প্রসবের ক্ষেত্রে এসব শিশুই প্রায়ই বেঁচে যায়। এ পর্যায়ে তাদেরকে পৃথক মানুষ বলে গণ্য করতে হবে আর তাই গর্ভপাতের মাধ্যমে তাদের হত্যার অনুমতি নেই।

তবে ইসলামে আরেকটি সাধারণ নীতি রয়েছে যা সবার উপর প্রাধান্য রাখে। তা এই যে, যদি উর্ধ্বতর ও নিম্নতর দুই অস্তিত্বের মধ্যে কোন একটিকে কুরবানী করার প্রশ্ন আসে তবে উর্ধ্বতর অস্তিত্বের জন্য নিম্নতর অস্তিত্বকে কুরবানী করতে হবে। তাই গর্ভের শেষ অবস্থায় হলেও যদি মায়ের জীবন বাঁচানোর জন্য অত্যাবশ্যক হয় তবে গর্ভপাতের মাধ্যমে সন্তানকে নষ্ট করার অনুমতি আছে বরং তা-ই করা উচিত।

সংকলন – **আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক**

ইসলামই মানব জাতির ধর্ম

কালান্তর গোত্রে গোত্রে রূহুলকুদুসগণ আবির্ভূত হইয়া খন্ড খন্ড সত্যগুলি যে পরম ও একমাত্র পূর্ণ সত্যের নির্দেশনা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই মতাদর্শগুলির সমষ্টিগত যে বিকাশ উহারই নাম ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম মূলত: ধর্মের পারাবার ধারা যাহা প্রবাহিত হইয়া অবশেষে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর সাথে একিভূতপূর্বক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই পরিপূর্ণ প্রাপ্ত দীনের পবিত্রতম স্বর্ণভান্ডার হইল ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ আল্-কুরআন। যাহার সর্বাগ্রের আবেদন হইল, "ইকরা বিসমে রাব্বি কাল্লাযী খালাক", (সুরা আলাক) অর্থাৎ হে সৃষ্ট জগত! অনুসন্ধান কর তোমার স্রষ্টাকে, যাঁহার অনুকম্পায় তুমি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে স্বীকৃত। এই দয়াদ্র আহ্বানের পথ অবলম্বন করিয়া মানুষ যদি জগত মোহের লালসা ও মমতাকে পরিত্যাগ পূর্বক জন্ম উদ্দেশ্যের সন্ধান লাভে প্রলুব্দ হয় এবং কর্তব্য কর্ম পালনে চেষ্টার ত্রুটি না করে তবে অবনি বুকে প্রশান্তির বায়ু বহিবে বৈ কি ? এরই নাম ইসলাম, যে দীন বা ধর্মে প্রক্ষিপ্ত সাড়ে সাত শত অনুশাসনের কেবল একটিকে অনুকরণের মাধ্যমেই শান্তির অনুকম্পায় সিক্ত হওয়া যায়। ফলেই আমি যুগে যুগে ধর্ম বহনকারী মর্তাগত পুণ্যাত্মাগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ঘোষণা দিতে চাই যে, হাঁ, "কেবল ইসলামই মানব জাতির একমাত্র ধর্ম"।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিস্তৃতিতে প্রবেশের পূর্বে প্রথমেই আমাদের অবহিত হওয়া দরকার যে, ধর্ম কাহাকে বলে। প্রাসঙ্গিক এই জিজ্ঞাস্যের পক্ষে বক্তব্য এই যে, ধর্ম মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে মানবজাতির জন্য এমন কোন মতানৈক্য নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা নহে, যাহা পালনে মানুষকে হিমালয় লংঘন সদৃশ পরিশ্রান্ত হইতে হয়, অর্থাৎ যাহার আদর্শকে সঙ্গ দেওয়ার কারণে জগত সংসার পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্য সাজিয়া জীবন পন সাধনা করিয়া কালতিপাত করিতে হয়। পক্ষান্তরে তাহা এমন কিছুও নহে যে, সাঝ-সকালে গাত্রে তৈল মাখিয়া, মোমের প্রদীপ জ্বালাইয়া ঢোল-কর্তাল বাজাইয়া স্ত্রীপুত্র মিলিয়া নাচ গান করিলাম, অথবা এমন কিছুও নহে যে, একজন পবিত্রাত্মাকে ক্রুশে ঝুলাইয়া অপবিত্র মৃত্যু ঘোষণা দিয়া নিজে আকণ্ঠ পাপে ডুবিয়া মুক্তির আনন্দে নৃতোৎসব করিলাম, বা এমনও নহে যে, উলঙ্গ শরীরে ভারী শিকল ঝুলাইয়া লেংটি পড়িয়া গাজায় টান দিয়া ঘন্টা কয়েক সূর্যাভিমুখে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। কিংবা তাহা এমন কোন বিধানও নহে যাহার উৎকর্ষতা দেখাইতে গিয়া জীব হত্যা মহা পাপ জ্ঞান করিয়া আহার ভোজন বর্জন করিয়া দিলাম। এর একটিকেও আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের কর্ম বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না। এর একটিও আত্মার জন্য তো নয়-ই দেহের জন্যও কল্যাণকর কর্ম বলিয়া বিবেচনা করা বিবেকবানের কাজ হবে না। কেননা, কোন নবীই তাঁহার স্বজাতিকে এমনি ধরনের শিক্ষা কখনও দেয় নাই কিংবা দিতে পারে না, যাহার দ্বারা আত্মার এতমিনান লাভ হয় না। এহেন উদ্ভট ধর্ম শিক্ষা পৃথিবীতে সংঘাত ব্যতীত জাতি সমূহের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। বরং ধর্ম হইল-স্বর্গ প্রসূত সুমহান শিক্ষা যাহা অনুসরণে মানুষ তাহার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে সাবলীলভাবে সুনিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয় এবং আত্মাসমূহ এই তায়েবা শিক্ষা লব্ধ করিয়া আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইয়া ক্রমান্বয়ে খোদামার্গে পৌছিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে। মূলত: ধর্ম হইল, আত্মার খাদ্য, তাহার পবিত্র পথে চলার প্রজ্জ্বলিত জ্যোতিষ্ক, আর ধার্মিকগণ হইল খোদার অস্তিত্ব বাহক এবং মানব মানবে প্রেম ও পুণ্যে বন্ধন সৃষ্টিকারী। এতদোদ্দেশ্যেই আল্লাহতাআলা তাঁহার মহান গ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ, "মানব জীবনের সৃষ্টির লক্ষ্য হইল এই যে, মানুষ যেন আল্লাহতাআলার সিফাতের বাহক ও বিকাশস্থল হয়" (সূরা জারিয়াত)।

সুতরাং এখন যদি আমরা বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মও তাহার বৈশিষ্ট্যসমূহকে ঘাটিয়া-তলাইয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করি তবে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হইবে যে, বর্তমান দিনে মানুষ জন্মের উদ্দেশ্য কতটুকু সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং কোন্ ধর্ম শিক্ষা দ্বারা মানুষ কতটুকু লাভবান হইতে চলিয়াছে। প্রথমেই ধরা যাক, হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মের কথা, তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম শিক্ষা ছিল- একজন এক গালে চড় কষিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাবস্বরূপ প্রতিপক্ষ ব্যক্তির গালে অনুরূপ মেজাযে একখান চড় কষাইয়া দেওয়া। অবশ্য স্বজাতির জন্য তখন তাঁহার তেমন শিক্ষা প্রদানই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাঁহার শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্ষমার ব্যাপারটা একেবারেই উহ্য ছিল। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্ষমাও যে শান্তির বিপ্লব সাধন করিতে পারে, এই আদর্শ চিন্তা তাঁহার ধর্ম শিক্ষায় স্থান পায়নি। ফলে পরবর্তীতে এই শিক্ষা ধীরে ধীরে চরম নিবির রূপ পরিগ্রহ করিল। তাই অত্র জাতিতেই তেরশত বৎসর পর প্রতিশ্রুত মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হইয়া প্রদত্ত মুসায়ী ধর্মমতের বিপরীত শিক্ষা দিতে হইল। অর্থাৎ কেউ যদি একগালে চড় কষাইয়া দেয় তবে বিনা প্রতিবাদে অন্য গালখানা পাতিয়া দাও। এতদোভয় শিক্ষার পরস্পর বিরোধ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আমরা নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, উল্লেখিত ধর্মমত বিলক্ষণ অপূর্ণ। যাহা মানুষকে কিয়ামত কাল অবধি নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম নহে। তাহাকে পূর্ণতম ধর্ম বলা যায় না। পরন্তু ইসলাম বলে, অন্ধের ন্যায় অপরাধকে কেবলই ক্ষমার অভ্যাসে পরিণত করিবে না। বরং অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিবে, প্রকৃত পুণ্য বা কল্যাণ কোথায়, ক্ষমা না শাস্তি প্রদানে ? সুতরাং যাহা ক্ষেত্রোপযোগী, তাহাই করিবে। কেননা তোমাকে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আল্লাহতাআলা অন্যত্র বলেন, তাহারাই সাধু, যাহারা ক্রোধ দমন করিবার স্থানে তাহাদের ক্রোধ দমন করে, এবং ক্ষমার উপযোগী ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করে।(৩ঃ১৩৫)

অপর আর এক ধর্মের শিক্ষা হইল, "জীব হত্যা ভীষন পাপ"। তবে তদীয় ধর্মানুসারীগণ মৃগ-মূন বর্জনপূর্বক আহার ভোজন করেন বলিয়া সৎসাহসে স্বীকার করিতে কদাচ সক্ষম হইবেন না। উপরন্তু এই ধারণাও পোষণ করেন যে, বিবাহ বন্ধনহীন জীবনই অধিকতর পুণ্যময়। আর এই নীতি খৃষ্ট ধর্মেও স্বীকৃত। কিন্তু কুরআন কোন অবস্থাতেই এই মানব কল্যাণ বিবর্জিত রীতিকে গ্রহণ করে না। কেননা বিগত দিনে স্বর্গাগত কোন পুণ্যাত্মাজনই তদ্রূপ প্রথাকে জীবনে ব্রত করিয়া নিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণিত নহে। যদি এতদিন এমনটি পালিত হইয়া আসিত তবে পৃথিবীর অন্যতম পুণ্য পুরুষ ধর্মধরার প্রদীপ্ত সূর্য আঁ-হযরত (সঃ)-এর মর্তাগমন আলবৎ সম্ভব হইত না। যে ক্রিয়া কলাপের মাধ্যমে ভূ-বুকে মানুষের আগমন ঘটে। বিধাতার সেই বিধিতে বাধ সাধিবার অধিকার কেউ রাখেন কি? মোটেই নয়। কাজেই ইসলাম বলে, "বৈরাগ্য ব্রত ধর্ম নহে"। উল্লেখিত উভয় ধর্মেরই মুখ্য বাণী হইল, হিংসা বর্জন কর, জীবনকে লালন কর। প্রতিশোধ গ্রহনে প্রতাপ খাটাইওনা। কিন্তু কার্যত তাহারা করিয়া থাকে এর উল্টোটা। দেশ ও জাতি সমূহে যুদ্ধায়োজনে অস্থির করিয়া রাখাই হইল তাহাদের বর্তমান সময়ের একমাত্র কাজ। তৎপর আসা যাক সনাতন ধর্ম চর্চ্চার কথা। যাহাকে স্মরণ হইলেই সন্ত্রস্তে চিত্ত কাঁপিয়া উঠে। শবদেহকে বহ্নিদাহ করা, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী এবং স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর জীবন বিসর্জন দেওয়া স্বহস্তে নির্মিত মৃত্তিকা মূর্তির চরণতলে নতজানু হইয়া প্রনাম ঠুকা ইত্যাকার বিবেক দংশনকারী বেনজীর কর্ম যুগান্তর তাহাদের মাঝে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যাহা শ্রী কৃষ্ণের শিক্ষা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া প্রতীয়মান নহে। অবশ্য বর্তমানে এইসব ভয়ঙ্কর রীতির বিরুদ্ধে এন্তার আপত্তি উত্থাপনের কারণে এবং বিজ্ঞজনের বিরূপ মন্তব্য হইতে পরিত্রাণের চেষ্টায় বর্ণিত কিছু কিছু প্রথাকে শিথিল করা হইয়াছে। সঙ্গত কারণেই ইহাকে পরিপূর্ণ ধর্ম বলিয়া মানিয়া নেওয়া যায় না।

কিন্তু বক্তব্য এই যে, ইসলাম উপরোল্লেখিত কোন শিক্ষাকেই মানব হিতৈষী শিক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে না। ইসলামের শিক্ষাতে অমূলক ক্ষমা, কিংবা চরম প্রতিশোধ আর জীব হত্যা মহাপাপ এবং সহমরণ এর কোনটারই স্থান নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম বলে, যাহা ক্ষমার্হ সেখানে ক্ষমাই উত্তম। আর যেখানে শাস্তি প্রদানে বিবেচিত, সেখানে শাস্তি দেওয়াই শ্রেয়। তবে এরজন্য-বিচারকের বিবেক দায়ী থাকিবে। বিচার কর্তা আল্লাহ্‌র সাহায্যকাম্যে বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিবেন ইহাই বিধান। যেন অপরাধীর অপরাধ অধিক শাস্তি না হয়। কখনও যেন লঘু অন্যায়ের জন্য গুরু দন্ডে দন্ডিত করা না হয়। পেশা ও নেশা হিসাবে চোর যে সাজা প্রাপ্তির যোগ্য, পেটের তাড়নায় চুরির জন্য তাহাকে যেন অনুরূপ সাজা দেওয়া না হয়। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাবৎ সৃষ্টির ওপরই মানুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব রহিয়াছে। সুতরাং তাহার জীবন ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন এবং বৈধ তাহা সে বধ করিবে অথবা জীবিত ব্যবহার করিবে ইহাই রীতিশুদ্ধ নির্দেশ। সুতরাং জীবহত্যা মহাপাপ এক্ষেত্রে অকেজো। তবে হাঁ- তাহার অধিনস্থ ক্রীতদাসই হউক আর পালিত পশুই হউক তাহাদের প্রতি যেন

অমানবিক আচরণ করা না হয়। কারণ অপ্রীতিকর ব্যবহার সংহার করার চেয়েও বেদনা বিধায়ক, যাহা বিখ্যাত লেখক Alex Helly তাঁহার Roots প্রবন্ধে প্রতীয়মান করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই ইসলাম তাহা বরদাস্ত করে না। কারণ ইসলাম শান্তি, প্রেম ও সৌহার্দের পুজারী। হায়! মানব হৃদয় বিজয় করার জন্য ইসলামে কতইনা অপরূপ ও অতুলনীয় মহিমাময় শিক্ষা রহিয়াছে। যাহা প্রনিধান করার যোগ্য। তাই কলম সম্রাট হযরত মসীহে মাওউদ কাদিয়ানী (আঃ) তাঁহার এক গ্রন্থে উক্ত করিয়াছেনঃ "ইত:পূর্বে ধর্ম কেস্‌সা কাহিনী আকারে প্রচলিত ছিল। কুরআন ইহাকে বিজ্ঞানে রূপায়িত করিয়াছে। ধর্মের প্রতিটি বিশ্বাসকে জ্ঞানের পোষাক পরাইয়াছে। রক্ত যেমন মাতৃস্তনে পৌছিয়া দুগ্ধে পরিণত হয়, তেমনি তৌরাত ও ইঞ্জিলের আদেশগুলি কুরআনে আসিয়া জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে"। এই মসীহেরই প্রতিষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়া আজ ইসলামের সেই মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা ইউরোপ ও এশিয়া পঞ্চ মহাদেশ ব্যাপিয়া প্রচার করিতে সর্বস্ব বিলাইয়া জীবনপণ সাধন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু হায়! আফসোস সেই চিত্তহীনদের জন্য যাহারা ব্যক্তিগত সার্থকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে এই এলাহী জামাতের ওপর বিবিধ এলজাম উত্থাপন করিয়া পরিণামে ফাঁসি মঞ্চে ঝুলিয়া অথবা মোবাহালার বজ্রাঘাতে ধ্বংস হইয়া জীবনেতিহাসকে কলংকের কালীমায় লেপন করিয়া গিয়াছেন।

ভূবনপৃষ্ঠে ধর্মের ঢোল-ঢাক পিটাইয়া আজ যেসব কান্ডকর্ম উৎযাপিত হইয়া চলিয়াছে তাহাতে সত্য অনুসন্ধিৎসুগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। যেমন- ধর্ম কি? তাহারই বা কি কর্তব্য? আল্লাহ্ কোথায় ? কীভাবে কোন্‌পথে তাঁহার সন্ধানে মিলিবে? ইত্যাকার জিজ্ঞাসার জবাব না পাইয়া মানুষ এখন নৈরাশ্যে পতিত হইয়া নাস্তিকতার দিকে যাত্রা করিয়াছে। কোন ধর্ম-মতই আজ এই সকল সমস্যার সমাধান দিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ তাহাদের ধর্মনীতি অসার ও অপূর্ণ। কিন্তু ইসলাম প্রতিটি মানুষেরই প্রবৃত্তি ও পবিত্রাত্মার খাদ্যের যোগান দিয়াছে এবং খোদা প্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছে। ইসলামের কুরআন ঘোষণা করিয়াছেঃ অর্থাৎ-"যদি আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তিনি কোথায়; তবে তাহাদিগকে বলঃ আমি তাহাদের নিকটেই আছি। বিনীত প্রার্থনাকারী যখন আমার সকাশে প্রার্থনা করে তখন তাহার উত্তর দিয়া থাকি। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাহাতে তাহারা সঠিক পথ পায়" (আল-বাকারা-১৮৭)। সুতরাং যাহার আত্মা তদপ্রয়াসী সে খুঁজিয়া লউক। দুনিয়াতে আজ ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম বলিয়া প্রকম্পিত কণ্ঠে দাবী করিয়া চলিয়াছে। কারণ ইসলামই এই দাবী করে যে, তাহার অনুকূলে প্রয়োজন বোধে স্বর্গবরণ্যজন আগমন করিবে। কেবলমাত্র ইসলামের প্রবর্তক সম্পর্কেই আল্লাহ জাল্লা শানহু বলিয়াছেনঃ অর্থাৎ-" সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থেই (হে মোহাম্মদ!) তোমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে" (আল-আম্বিয়া-১০৮) অতএব ইসলামের রসূল ব্যতীত আর কোন নবীকেই তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেন নাই। ইসলাম যে বিধান ও আইনে পরিচালিত তাহার সাথে কোন ধর্মেরই তুলনা চলে না। তাই হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানি(রাঃ) তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেনঃ" আমি এইজন্য ইসলাম বিশ্বাস করি যে, ইহা আমার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাসমূহকে বিনাশ করিতে প্রয়াস পায় না, বরং তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতে সহায়তা করে; ইহা আমার প্রবৃত্তিসমূহকে সমূলে ধ্বংস করতঃ আমাকে প্রস্তরে পরিণত করে না; বরং একজন সুদক্ষ জলসরবরাহকারী ইঞ্জিনীয়ার যেমন অসংযত জলকে সংযত করিয়া তাহা জল সরবরাহকারী খালে প্রবাহিত করতঃ তদ্বারা অনুর্বর ভূমিতে উর্বর করে, তেমনি ইসলাম আমার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাসমূহকে সংযত ও সুপরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ নৈতিকগুণে পরিণত করে।"(১৯-২-৪০ ইং বোম্বে) ইসলাম তাহার অনুসারীকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, দুনিয়াকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে হইলে প্রথমে তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে শান্তির বুনিয়াদ গড়িয়া তোল। দরকার বশতঃ সালোনে অধিক সরোয়া দাও,যেন তাহা হইতে প্রতিবেশীকে ভাগ দেওয়া যায়। ইসলামের এই ক্ষুদ্রতম আদেশটির মধ্যেও যথেষ্ট সহমর্মিতা বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ তাহার সমতুল্য কোন নির্দেশও অন্যসব ধর্মানুসারীদের মধ্য হইতে সহজ অনুসন্ধানে পাওয়া সম্ভব হইবে না। বরঞ্চ প্রত্যেকেই তাহার প্রতিবেশীকে বিনাশ করিতে ভয়ংকর মারণাস্ত্র নিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে সুযোগের সন্ধানে।

এমনি ধরনের আরও বহুবিধ ধর্মশিক্ষা বিভিন্ন ধর্মে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা নিয়া সমালোচনা করিলে দীপ্ত সূর্যের ন্যায় অবশ্যই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু লেখার কলেবর দীর্ঘ হইয়া যাওয়ার শঙ্কায় আর অধিক অগ্রসর হইতে বিরত রহিলাম। হযরত যীশু স্বয়ং স্বজাতিকে বলিয়াছেনঃ "হে আমার জাতি! তোমাদের নিকট আমার আরও বহুকিছু বলার ছিল, কিন্তু এখন তোমরা তাহা বুঝিবে না। যখন সত্যের আত্মা আসিবেন তখন তিনিই তোমাদেরকে তাহা জ্ঞাত করাইবেন। আমি চলিয়া যাওয়াই তোমাদের জন্য মঙ্গল। কারণ আমার চলিয়া যাওয়ার পরই সেই সত্যের আত্মা আসিবেন; যাঁহার পাদুকা খোলার যোগ্যও আমি নহি" (New Testament) পাঠক। সেই আত্মাই নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) রহমতুল্লিল আলামীন; যাঁহার সম্পর্কে খোদা বলিয়াছেনঃ অর্থাৎ-"হে মোহাম্মদ! তোমাকে সৃষ্টি না করিলে আমি কিছুই সৃষ্টি করিতাম না"(হাদীসে কুদসী)।

এখন শুধু কোন প্রয়াসে ইসলাম বিশ্বমানবের একমাত্র কল্যাণকর ধর্ম বলিয়া দাবী রাখে তাহার স্বপক্ষে কতিপয় যুক্তি উপস্থাপন করিয়া আমি আমার বক্তব্য সমাপন করিতে চেষ্টা করিব। আল্লাহতাআলা পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরার প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেনঃ অর্থাৎ-" আমি আল্লাহ সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। কুরআন পূর্ণ কিতাব। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা খোদাভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক।" এই আয়াতগুলি পাঠোত্তর দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথমতঃ সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী আল্লাহতাআলা বলিতেছেন -ইহা পূর্ণ কিতাব। সুতরাং কুরআন নাজেল হওয়ার পূর্বে যতসব ধর্মগ্রন্থ রহিয়াছে, তাহার সবই অপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ এই কিতাবে মোটেই সন্দেহ নাই। অতএব, হে সৎচিন্তাবিদগণ। ইহাতে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বেকার ধর্মশাস্ত্র সমূহে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যাহা খোদাকাঙ্ক্ষীদের পথ দর্শাইতে অসমর্থ। উক্ত উক্তির দ্বারা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, ইসলামের যে শিক্ষা তাহাই আমাদের জন্য পূর্ণ ও সন্দেহাতীত শিক্ষা। কারণ কেবল কুরআনই "কালামুল্লা'র দাবীদার। আর কোন ধর্মগ্রন্থই কালামুল্লাহ বলিয়া দাবী করার সৎসাহস পোষণ করে না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেনঃ অর্থাৎ- "আজ আমি তোমাদের জন্য ধর্মকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি," (আল-মায়দা-৪)। তিনি সুরা রূমের ৩০-৩১ আয়াতে আরও বলেনঃ অর্থাৎ-"মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইসলাম রাখা হইয়াছে। খোদা মানুষকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইসলামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।" সুতরাং এতসব বৈসাদৃশ্য আলোচনা ও তথ্যীয় যুক্তি উদ্ধৃতির পর আর না বুঝার মোটেই অবকাশ থাকে না যে কোন ধর্ম মানব জাতির একমাত্র ধর্ম। কারণ মানুষের প্রবৃত্তির মাঝেই আল্লাহতাআলা ইসলামের বীজ প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন।

তাই হে মানব মণ্ডলী; জানিয়া রাখুন। ইসলামের সুশীতল বারিধারায় অবগাহন না করা অবধি বিশ্বের এই প্রজ্জ্বলিত অশান্তি তিরোহিত হইবে না। ইসলাম শান্তির ধর্ম, প্রেমের ভাণ্ড, আত্মার আশ্রয় ও কান্নার অবসান। ইহাই সত্য যে, বিশ্ব বিবেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু ঘুরিয়া অবশেষে ইসলামে আসিয়াই স্বর্গের পথ সন্ধান করিবে। মাত্র স্বল্প সময়ের ধৈর্যের প্রয়োজন। আজ মানুষের মনে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হইয়াছে আর বর্তমানে মানুষ যে ধরনের মুশকিলাতে নিপতিত হইয়াছে তাহার হইতে পরিত্রাণের সন্ধান দেওয়া ইসলাম ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ যুগ ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেনঃ "যদি কুরআন আকাশ হইতে অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া অপবিত্র মাংস পিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কেবল কুরআনেই মানবমণ্ডলী জন্য সকল কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।"

অতএব সর্বপ্রথম যে বাক্য দিয়া শুরু করিয়াছিলাম, সর্বাগ্রে তাহাই বলিবারে, চাই যে, হাঁ,- ইন্নাদ্ দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম", কেবল ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। হে বন্ধুবর। ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করাই আমার মুখ্য অভিলাষ নহে। পরন্তু উদ্দেশ্য হইল, আমরা কোন পথ অবলম্বন করিলে বা কাহার আঁচল ধরিয়া যাত্রা করিলে আমাদের সেই খোদার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইব যিনি মানুষকে তাঁহার আদর্শ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আসুন, আমরা আমাদের অন্তরের ধ্বংসাত্মক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং যুদ্ধায়োজন হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করি, আর ফিরাইয়া আনি শান্তি ও প্রেমের উৎসব প্রতিটি গৃহাঙ্গণে। হায় সেদিনটি কবে আসিবে।

- মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী।

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

জলসার পরদিন বিভিন্ন স্থানীয় জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই)-এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসের আহমদ, নাযের ইসলাহ্-ও-ইরশাদ

তেজগাঁও জামাতে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই)-এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসের আহমদ, নাযের ইসলাহ্-ও-ইরশাদ পাশে উপবিষ্ট আছেন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

নারায়নগঞ্জ জামাতে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই)-এর প্রতিনিধি মাওলানা রাজা নাসের আহমদ, নাযের ইসলাহ্-ও-ইরশাদ পাশে বঙ্গানুবাদ করছেন সদর মূরব্বী মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব।

New Vol. No. 62 ❑ 15th Issue

February 15, 2000 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

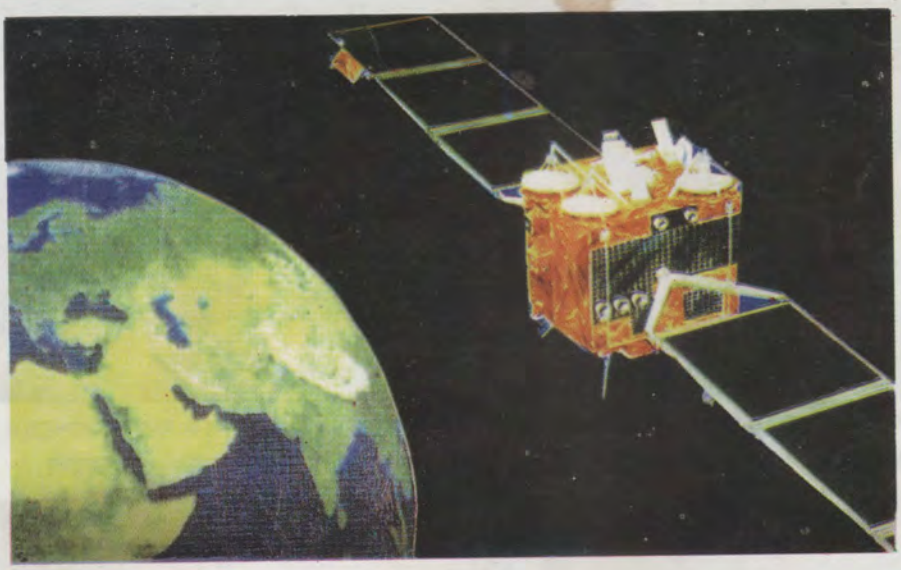

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV
AHMADIYYA
International

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক বুধবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272